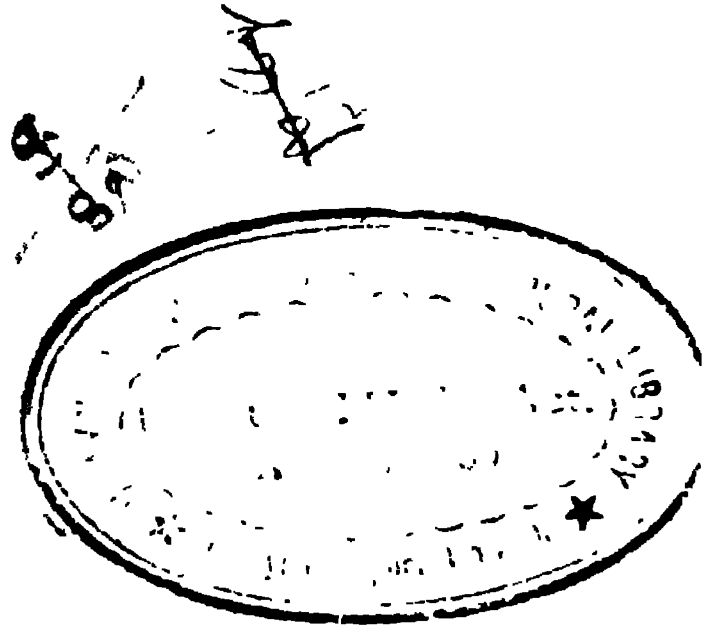
অকৃতজ্ঞ পৃথিবী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ



উদয়াচল কার্য্যালয়
১২৭ লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

দেড় টাকা

প্রথম সংস্করণ

শ্রাবণ, ১৩৪৭

উদয়াচল কার্য্যালয়ের পক্ষে মণ্ডল প্রেস, ১২৭ লোয়ার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা হইতে শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় এম্-এ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দাদামশাইকে দিলাম

ভাটপাড়া
২৩শে আষাঢ় ১৩৪৭ }

রবীন্দ্র

অভিনয় নয়

ডাক্তারী পাশ ক'রে সমর একটা বছর দু'হাতে উড়িয়েছে তার পূর্ব্ব-পুরুষের সঞ্চিত টাকা এ্যাপারেটাস্ কিনে আর নার্শিং হোম্ খুলে। কিন্তু কোলকাতার রোগীগুলো যখন এক জোট হ'য়ে ধর্ম্মঘট ক'রে বসল তখন তার আশা স্রোতে পড়ল ভাঁটা। বাবা কাণ ধরে টেনে আনলেন ভাটপাড়ায়। সৌখীন কোলকাতার সৌরভ তার কপালে লেখা নেই। বিবর্ত্ত ভাঙা কেউটের মত গজ্ গজ্ ক'রতে ক'রতে সে ভাটপাড়ায় এসে গেড়ে বসল। এখানে শহরের সুবিধা আছে পর্য্যাপ্ত অথচ পল্লীর প্রাচুর্য্যের অভাব নেই। টকি, পিচের রাস্তা, কলের জল, ইলেকট্রিক আলো সবই আছে আবার এঁদো পুকুর, রাতে শিয়ালের ডাক, সামাজিক দলাদলি প্রভৃতির অনাটনও নেই। তাছাড়া মিলের বস্তি মহল্লায় মড়কের প্রতিযোগিতা লেগে যায় নিত্য নিয়ত। ডাক্তারির পক্ষে যেটা দুর্দ্দমনীয়, ডাক্তারের পক্ষে সেটা লোভনীয়।

যে রাস্তাটি ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে সর্পিলগতিতে পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছে, তার গায়েই সমর হাল ফ্যাশানের ডিস্পেনস্ারী খুলল। চব্বিশ ঘণ্টা এইখানে বসে থাইসিসের ওষুধ আবিষ্কার ক'রে নোবেল প্রাইজ পাবার স্বপ্ন তাকে উৎসাহিত ক'রে তুললে। উৎসবের নৈরাশ্যের সঙ্গে আশার মহোৎসব সুরু ক'রে দিয়ে আবার চলল।

এখানে লাভ অগাধ না হোক থেকে লোকসান নেই। অপেক্ষা শুধু ভবিষ্যতের ভাগ্য আলোড়নের আব বৃদ্ধ ডাক্তারগুলোর মৃত্যুর।

দৈনিক রোগীর সংখ্যা বেশী নয়; দশ থেকে পনর। পসার না বাড়ুক প্রতিপত্তি বাড়ছে। যশটা যে রেটে ছড়িয়ে পড়বে সমর আশা ক'রেছিল স্পীড্টা তাব চেয়ে ঢের কম বটে কিন্তু ক্ষতি নেই তা'তে। টাক পড়বার আগেই যে টাকা আসবে এ বিষয়ে সে স্থির নিশ্চিত হ'য়েছে।

সমর ঘড়ির পানে তাকিয়ে দেখলে, এগারটা। এখনো একঘণ্টা সে এইখানে বসে থাকতে পারবে। অগত্যা নিজের পাণ্ডিত্যকে ঝালিয়ে নেবার জন্যে সে নতুন মেডিক্যাল জার্ণালখানা চোখের সাম্নে ধরলে; কিন্তু একটা পরিচ্ছেদ শেষ হবার আগেই মোটারের ব্রেকের শব্দে তার তন্ময়তার তার কেটে গেল। সাম্নের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিতেই দেখতে পেলে শিবনাথকে। অকারণ ভদ্রতা দেখাবার প্রয়োজনে তাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না। শিবনাথ আলাপি বন্ধু হ'লেও আন্তরিকতা মনের মণিকোঠায় এসে পৌচেছে। নতুন কেসের শেষটা পড়বার কৌতূহল দমন ক'রে সমর বইখানা ড্রয়ারে পুরে রাখবার আয়োজন ক'রছিল, শিবনাথ অপর একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে সঙ্গে নিয়ে হুড়মুড় ক'রে প্রবেশ ক'রলে। সঙ্গের আগন্তুককে সমুচিত সম্মান দেখাবার উদ্দেশে সমর দাঁড়িয়ে উঠল।

সঙ্গীটির পরিচয় দিয়ে শিবনাথ বললে, ইনি হ'চ্ছেন মিঃ গুপ্টা। বাড়ী করাচিতে : বাসা কোলকাতায়। মোটারের দালালি করেন। আপনার মোটার কেনবার সখ হ'য়েছে শুনে দেখা ক'রতে এসেছেন।

পাশ্চাত্য কায়দায় অভিবাদন বিনিময় হ'ল। সমর তাকে খাতির ক'রে বসালে।

শিবনাথ বললে, আমার কারখানা ইনিই দিয়েছেন।

মিঃ গুপ্টা কোন্ কোন্ রাজা-মহারাজা, সাহেব-সুবো, এ্যক্টার-এক্ট্রেসদের মোটার গচিয়েছেন তার একটা সুদীর্ঘ ফিরিস্তি জলের ন্যায় তরল ভাবে ব'লে গেলেন। যাঁদের নাম তার মুখে উচ্চারণ হ'ল, তা শুনে সমরের একটু আশ্চর্য্য ঠেকল। ঐ সব লোকেদের যে মোটার বিক্রি করে, সে নিতান্ত সাধারণ নয়।

শিবনাথ নিজে একটা সিগ্রেট জ্বালিয়ে নিয়ে অপর একটা গুপ্টার দিকে ছুঁড়ে দিলে। সমর খায় না: সে জানে।

এক মুখ ধোঁওয়া সরু ক'রে দূরে ঠেলে দিয়ে মিঃ গুপ্টা বললেন, এখানে বিক্রি ক'রেছি অনেক স্যার্। জানুয়ারীতে ভাটপাড়া কলের ম্যানেজারকে একখানা অষ্টিন্ দিয়েছি। গৌরীপুরের ল্যাংফোর্ড সাহেব নিজের খানা বদলে নতুন মাষ্টার বুইক্ নিয়েছে। ইয়ার্ড্ সুপারেন্টেণ্ডকে থারট্টীনাইন্ মডেলের মরিস্ গাড়ী বিক্রি ক'রেছি ইন্‌ষ্টল্‌মেণ্টে।

কথাগুলো শুনে সমর আশ্বস্ত হ'ল। তারও একখানা কেনবার সখ চেপেছে মাথায়। যদিও সাইক্লে তার সব কাজই উপস্থিত চলে যাচ্ছে, তবুও যেন আরামের জন্যে একখানা কার্ অনিবার্য্য হ'য়ে পড়েছে। সহানুভূতির দুর্ব্বলতায় পড়ে সে নিজের ভীরু বাসনাকে ব্যক্ত ক'রে ফেললে।

মিঃ গুপ্টা এ্যাটাচি কেসের মধ্যে থেকে গুচ্ছির ক্যাট্‌লগ্ বের ক'রে সমরের সাম্নে খুলে খুলে দেখাতে লাগলেন। সবগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ক'রে সমর নিজের পছন্দ জানালে। তিনজনের মধ্যস্থতায় নতুন মডেলের হুইট-পেট্ কেনা হবে স্থির হ'ল। অব্যর্থ শীকারের সন্ধান পেয়ে মিঃ গুপ্টার মুখখানি উৎফুল্লিত হ'য়ে উঠল। এত সহজে তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কারুকে বাগ মানাতে পারেননি। কত হাঁটাহাঁটি, কত খোসামোদ ক'রেও তাঁকে কত জায়গা থেকে

বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে আসতে হ'য়েছে। নিজের লাভ-লোকসান, কোম্পানীর সাধুতার হাজার হাজার নজির দেখিয়েও তিনি অনেকের মন ভেজাতে সক্ষম হননি। বাংলা দেশের লোকগুলোর ওপর তার একটা বিশ্রী ধারণা জন্মে গিয়েছিল। সমরের এই সরল স্বীকৃতি আজকে তাঁর সে-ভুল ভেঙ্গে দিলে। উজ্জ্বল হেসে মিঃ গুপ্টা বললেন, আপনার সঙ্গে চেনা পরিচয় হ'ল, এটাও আমার পক্ষে কম লাভ নয়! জানেন স্যার, এই ক্যানভাসার লাইনে থাকতে থাকতে কত লোকের সঙ্গে ফ্রেণ্ডশিপ্ হ'য়েছে তা আর কি বলব।

শিবনাথ কথাটা সমর্থন ক'রে জানালে, রাজ্যিশুদ্ধ সকলের সঙ্গে এঁর আলাপ। একদিন সঙ্গে গেলেই বুঝতে পারবেন।

সমর বিবর্ণ একটুখানি হাসলে। নিজেকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্মে নয়, বন্ধুত্বের মর্য্যাদাকে বড় ক'রে দেখাবার জন্যে।

মিঃ গুপ্টার উৎসাহ যেন বেড়ে গেল। হেতমপুরের জমিদারের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের ইতিহাস শুনিয়ে দিতে আরম্ভ ক'রলেন। সত্যিই সে এক অভিনব কাহিনী। গোড়াতেই রোমান্সের গন্ধ পেয়ে শিবনাথ তাঁর প্রতি কথাটা গিলে যেতে লাগল। সে যে অতিমাত্রায় মুগ্ধ হ'য়ে গেছে তা তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে পরিষ্কাররূপে। কথাগুলো অবিশ্বাস্য নয়: ঘটনার কথা অবশ্য শিবনাথ জানে না। হেতমপুরের জমিদারের বহু চিঠি সে দেখেছে। দেখিয়েছেন মিঃ গুপ্টা। সমরের এসব কথা মোটেই ভাল লাগছিল না। না লাগবারই কথা। বারোটা বেজে গেছে। সকাল থেকে সে বিশ্রামের অবসর পায়নি মোটেই। নিজের অজ্ঞাতসারে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল। শিবনাথের ডাকে তার চমক ভাঙল।

সমর বললে, আপনার বন্ধুটি যথার্থই এ বিষয়ে এক্সপার্ট। নইলে—

শিবনাথ বললে, হ'য়েছে কি? আরো কত শুনতে পাবেন। এখুনি এঁকে কোলকাতায় ফিরে যেতে হবে তাই। কে এক নতুন টেলিফোন কোম্পানীর ম্যানেজার এসেছে। দেডটার সময় তার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট। সাকসেসফুল হ'লেই বড ভোজ। কি বলেন মিঃ গুপ্টা, একেবারে পেলিটিতেই তো!

—সে আর বেশী কথা কি? এখুনি তো যেতে পারেন! নিজের ঘডির পানে তাকিয়ে মিঃ গুপ্টা চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। তাডাতাড়ি ক্যাটলগ্‌গুলো সযত্নে এ্যাটাচি কেসের মধ্যে পুরে তিনি সোজা হ'য়ে দাডালেন। সময়মত একদিন কোম্পানীর অফিসে নিয়ে গিয়ে ডিমোন্সট্রেশ্যানের ব্যবস্থা ক'রবেন জানিয়ে তিনি তখুনি চলে গেলেন।

কয়েকদিন পরের ঘটনা—

শিবনাথ বসে সিগ্রেট ফুঁকছে : সমর এসে ঘরে ঢুকল।

শিবনাথ চেয়ার ছেডে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, শুনেছেন?

—না।

—হাডকিপ্পন চৌধুরীকে গুপ্টা আজ একখানা গাডী কিনিয়ে ছেডেছে। লোকটার আর কিছু না থাক ক্যেপাসিটি আছে। যে পয়সা খরচ হবে ব'লে কোনদিন লিলুয়া ডিঙোলে না তাকে দিয়ে নগদ সাতাশ শ' টাকা বের করান' মোটেই সোজা নয়। একটা মাস চৌধুরীকে একা থাকতে দেখলুম না! তখনই অনুমান ক'রেছিলুম! চিনে জোঁক একেবারে : কিনিয়ে তবে ছাডলে।

—ওঃ, এই কথা। আপনার আগ্রহের ধরণ দেখে ভেবেছিলুম, গঙ্গার সেই কুমীরটা ধরা পড়েছে। সমর নিজের আসনে ব'সে বললে।

—কুমীর ধরা পড়ার চেয়ে ইণ্টারেষ্টিং খবর নয় কি? শিবনাথ মুখের সিগ্রেট ফেলে দিয়ে বললে, আমরা তার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে

মিশছি। কখনো তাকে একপয়সার চিনেবাদাম কিনতে দেখলুম না। অথচ ব্যাঙ্কব্যালেন্স্, বাড়ীভাড়া, জমিদারী, তেজারতী—কি নেই? যাই বলুন সমরবাবু, গুপ্টার বাহাদুরী আছে।

—যতই বাহাদুরী থাক, ও লোক সুবিধের নয়। সেইদিনই ওকে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হ'য়েছিল। ওকে দেখে মনে হয়, সাহেবী পোষাকের ছদ্মবেশে আসল রূপ ও ঢেকে রেখেছে। লোককে ধাপ্পা দিয়ে, রঙচঙে কথা শুনিয়ে একখানি মোটার বিক্রি করা চাড্ডিখানি কথা নয়—তাও নয় স্বীকার ক'রলাম। কিন্তু ওর মুখখানা দেখে মনে হয় ওরকম মিস্‌চিভ্যাস্ লোকের জোড়া নেই। ওর কথা বলবার ঢংয়ে, চোখের চাহনিতে আমার তাই মনে হয়, লোককে ঠকানই ওর কাজ! আপনি ওর কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছেন একটাও, না ওকে যুধিষ্ঠির ঠাওরে বসে আছেন।

—ওকে বিশ্বাস করি না, অবিশ্বাসও করি না। কারণ আমার সে কথা জেনেও লাভ নেই। ও হয়ত কার মুখে শুনেছে আপনার গাড়ী কেনবার কথা। শিবনাথ অবশিষ্ট সিগ্রেটটুকু ফেলে দিয়ে বললে, আমি ওর থ্রু দিয়ে গাড়ী কিনেছি সেই সূত্রেই আলাপ, তাই আমাকে সঙ্গে ক'রে আপনার কাছে এসেছিল বেশী সুবিধা হবে ব'লে।

সমর একটু নড়ে বসল। তার দুশ্চিন্তা হওয়া নির্ভুল। অন্তরঙ্গতার জমাট প্রলেপ এখনো জমেনি: উভয়ের সম্বন্ধ মাত্র বাধ্য বাধকতায় এসে পৌঁচেছে। অনায়াসে তাকে সে এড়িয়ে চলতে পারবে। অলক্ষ্যে এই সব চিন্তা ক'রে নিয়ে সে বললে, আজ আবার এসেছিল। এসেছিল অবশ্য আমাকে কোম্পানীর অফিসে নিয়ে যাবার জন্যে। ডিমোন্স্‌ট্রেশানের খুব সুবিধা হবে ব'লে। যে লোকটা ডিমোন্স্‌ট্রেশান দেয়; তাকে ব'লে ক'য়ে গুপ্টা লম্বা একটা ট্রিপের ব্যবস্থা ক'রে এসেছে। ও ভেবেছিল ডায়মণ্ডহারবারের নাম শুনেই আমি লাফিয়ে উঠব।

তা শুনেও যখন যেতে রাজী হলুম না, তখন সে বললে, হেতমপুরের সেই জমিদারবাবুটিও আজ ডায়মণ্ডহারবারে যাচ্ছেন। সঙ্গে সেই মেয়েটিও থাকবে। শুনে আমার মেজাজ গেল বিগড়ে। সাফ্ জবাব দিয়ে দিলুম, গাড়ী কিনব না। নিজের ইচ্ছে আছে কিন্তু বাবার অমত। ওর মতলব খানা কি বলুন তো শিবনাথবাবু?

—মতলব আর কি? একখানা কার্ বিক্রি করা আর মোটা কমিশন পকেটস্থ করা।

—মোটার বিক্রি করার মধ্যে ডায়মণ্ডহারবারে নিয়ে যাবার কোন কারণ থাকতে পারে না: জমিদারবাবু ও সেই মেয়েটীর সঙ্গে আলাপ ক'রিয়ে দেবার কোন মানে হয় না। ওদের পাল্লায় কোনদিন পড়িনি বটে শিবনাথবাবু কিন্তু ওদের চিনতে আর বাকী নেই। ওকে আপনি চিনতে পারেননি। আপনাকে নিরীহ গোবেচারী পেয়ে সব জিনিষ বিশ্বাস ক'রিয়ে নিয়েছে। যদি মোটার বিক্রি করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ত, লোকটা নানারকম লোভ দেখাত না। আচ্ছা, আপনিই বলুন না, আপনি হ'লে কি এইরকম ক'রতে পারতেন? লোভ দেখাক আর যাই করুক শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু টলিনি। যাবার সময় অবশ্য সে বন্ধুভাবে বিদায় নিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে এসে দেখা করবে—একথাও জানিয়ে গেছে।

—এত সহজে ছেড়ে যাবার পাত্র সে নয় সমরবাবু! চৌধুরীকে যখন ও দিতে পেরেছে—

সমর শুধু একটুখানি হাসলে।

অনেক রোগী এসে জমা হ'য়েছে, সমর নিবারণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী থেকে ফিরে এসে দেখলে। টাটকা কাগজখানা টেবিলের এক পাশে ঠেলে রেখে রোগীদের পরীক্ষা করবার জন্যে সে প্রস্তুত হ'ল। বাঁ

দিকের লম্বা বেঞ্চিটায় সকলে সারবন্দী হ'য়ে বসে আছে। দৃষ্টি বেঁকিয়ে মুহূর্তে সে একবার আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর সামনের টেবিলের দিকে সামান্য একটুখানি ঝুঁকে জিজ্ঞেস ক'রলে, কি জনার্দ্দন, আজকের খবর কি?

—জ্বর আজ আসেনি। তবে বুকের ব্যথাটা এখনো কমেনি।

—কমেনি? সেই মালিসটা ঠিক মত পড়েছিল তো!

ঘাড় নেড়ে জনার্দ্দন বললে, হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু। সকাল-সন্ধ্যে দু'বারই দেওয়া হয়।

—আচ্ছা, তুমি উঠে এস।

জনার্দ্দন সমরের সামনে এসে দাঁড়াল।

সমর স্টেথিস্কোপ দিয়ে তার সমস্ত বুকখানা দস্তুরমত পরীক্ষা ক'রে ঘাড় নেড়ে বললে, কই সর্দ্দির তো কিছুই টের পাচ্ছি না। ও কিছু নয়। ফিক ব্যথা। মালিসটা লাগিয়ে যাও, সেরে যাবে।

—যে আজ্ঞে।

বিভূতিবাবু এগিয়ে এলেন।

নাড়ী টিপে সমর বললে, আজ তো দেখছি ভালই আছেন।

—কাল সারারাত ঘুম হয়নি মাথার যন্ত্রণায়। তাছাড়া তেষ্টাও ছিল।

—ও কিছু নয়। ভাবিয়ে দিয়েছিল যেদিন থেকে আপনার পেট কাঁপতে আরম্ভ হ'ল। প্যারাটাইফয়েডে টার্ন নিতে পারত। ভাগ্যিস্ আগে থেকে কশান্ হ'য়েছিলুম তাই বাড়তে পারলে না। এখন ঐ মিক্শ্চারই খেয়ে যান। একাদশী না যাওয়া পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলবে।

বিভূতিবাবু সরে গেলেন।

—কি খবর ভট্চায্যি মশাই?

—কালও পা ফুলেছিল। রামধনু ভাবটা মোটেই কাটেনি।

—তেল একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন তো ? না—

—আপনার কথামত সব ব্যবস্থাই তো চলেছে।

চোখের তলার পাতায় হাত দিয়ে টিপে সমর বললে, টেন্‌শান্‌টা একবার এগ্‌জামিন ক'রে দেখব। মনে হ'চ্ছে কিছু বেড়েছে। কুলে-খাডা বোধ হয় বন্ধ ক'রে দিয়েছেন ? পড়াশুনো কিন্তু একটুও চলবে না। ···হ্যাঁ রুটি খাচ্ছেন তো ? দু'বেলাই খেতে হবে। চলুন, টেন্‌শান্‌টা আগে দেখে দি'।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আস্ত একটা দুর্ভাবনা বুকে পুরে।

নরেন এল : কাশতে কাশতে কাল তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছিল।

বুক পরীক্ষা করবার পর সমর বললে, এক্স্‌রে করাতে হবে। ষোল টাকা খরচ।

—ষোল টাকা কোথায় পাব ডাক্তারবাবু, বড় গরীব।

—কিন্তু অসুখটা যে তোমার বড়লোকের।

—কি ক'রে যোগাড় ক'রব ডাক্তারবাবু, একে কাজ নেই। গেল মাসে সাহেব ব্যাটা তার এক পেয়ারের বাবুকে এনে ঢোকালে আমার জায়গায়। আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রতে পারি ; আমি এক পয়সাও চুরি করিনি।

—তবে মেডিক্যাল কলেজে যাও। তিন টাকায় হবে। আমি বরং একখানা চিঠি লিখে দিতে পারি ওখানকার ডাক্তারকে।

—তাই দিন ডাক্তারবাবু।

—আচ্ছা, সন্ধ্যের সময় এস।

নরেন সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

রামদীন ময়লা ছেঁড়া ব্যাপারখানা মুড়ি সুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল।

সমর নাড়ীর গতিবেগ নিরীক্ষণ ক'রে বললে, ও-ই দাওয়াই মোল লিয়া তো!

রামদীন লম্বা ঘাড নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললে, হাঁ। ডাগ্‌ডার্ সাব্‌-লেগিন্ বোখার্ নেহি ছোড়তা। বিনা সুঁই মে কভি নেই ছুটে গা।

—দাওয়াই পিনেসে ও হট্ যায়গা। সুঁই দেনে কা আভি কুছ্‌ জরুরাৎ নেহি হ্যায়। তোম সর্দার, ঘাবড়াও মাৎ।

রামদীন বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে নিজের ওপর সে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। তার ওপর দেশ থেকে খবর এসেছে বৌয়ের খুব অসুখ। সেখানে যাবার জন্যে তার মন পড়ে রয়েছে অথচ নিজের ব্যামোর জন্যে না পারছে সে কিস্তির টাকাগুলোর মায়া ছাড়তে, না পারছে যেতে। বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারে না, তাগাদা ক'রবে কখন? তাই রোগমুক্ত হবার বাসনা তার দুরন্ত। এতগুলো দিন সে রোগকে অবহেলা ক'রে পয়সার প্রতি দরদ দেখিয়েছে। এখন বুঝেছে, রোগকে অনাদর ক'রে সে যথেষ্টই ঠকেছে: চার পয়সার ওষুধ সেবে উঠতে গিয়ে রোগকে শক্ত ক'রে তুলেছে। তাই সে আজ বলতে পেরেছে, বিনা সুঁই মে নেহি ছুটে গা।

এই রামদীন চটকলে সর্দারী ক'রে দু'হাতে টাকা লুটেছে, একথা এ অঞ্চলের সবাই জানে। দেশে জমি-জমা ক'রেছে সে যথেষ্ট: এইখানেও তিনখানা লাইন-বাড়ী তৈরী ক'রে সে ভাড়াটে বসিয়েছে। এর ওপর তেজারতি চলেছে টাকায় দু'আনা সুদে। অথচ দৈন্যতা তার সবতাতেই। দামী ওষুধ লিখে দিলে কিনবে না। সমরের দু'টো পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলবে, কাঁহা মিলেগা বাবুজী, দো মাহিনা ছুটিমে হ্যায়। আজকের তার এই বেপরোয়া ভাব দেখে সমর অনেকখানি আশ্বস্ত হ'ল।

প্রেস্‌কিপ্‌শ্যান লিখতে লিখতে সমর জানালে, আওর এক শিশি পিনেসে আলবাৎ ছাড়্‌ যাগা।

—আপ্‌কো মেহেরবাণী ডাগ্‌ডার্‌ সাব্‌।

প্রেস্‌কিপ্‌শ্যান নিয়ে রামদীন ডিস্‌পেন্‌স্যারীর মধ্যে চলে গেল। সমর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চেয়ারটায় বাগিয়ে বসে খবরের কাগজখানা টেনে নিলে। হিটলার মুসোলিনী এককাট্টা হ'য়েছে, জবর খবর। কিন্তু সে সম্বন্ধে সম্পাদকের মন্তব্য আর দেখা হ'ল না। অবগুণ্ঠিতা একটি নারী ধুঁকতে ধুঁকতে তার ডাক্তারখানায় ঢুকল। পথ চলার অবসন্নতায় মেয়েটি তার শরীরকে আর দাঁড় ক'রিয়ে রেখে দিতে পারলে না। ঘরের এককোণে মেঝেতে বসে পড়ল। তার জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলার শব্দ বেশ স্পষ্টই কাণে এল। খানিকক্ষণ তাকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে সমর প্রশ্ন ক'রলে, কি হ'য়েছে তোমার ?

ঘোম্‌টার ভেতর থেকে উত্তর এল, প্রায় জ্বর হয়। এবারে বড্ড ভোগাচ্ছে। অন্তবারে এতদিনে ছেড়ে যায়; এতখানি দুর্ব্বলও ক'রতে পারে না।

সমর তাকে কাছে আসবার আদেশ ক'রলে। মেয়েটি আস্তে আস্তে তার সাম্নে এসে দাঁড়াল। নাড়ী পরীক্ষার শেষে সমর বিস্ময়ে বললে, জ্বর তো এখনও রয়েছে। আচ্ছা, তুমি কতদিন ধরে ভুগছ?

—একমাস হ'তে চলল ডাক্তারবাবু।

ধমক দিয়ে সমর বললে, এতদিন আসনি কেন তবে ?

—ভেবেছিলুম ছেড়ে যাবে ডাক্তারবাবু। তাছাড়া হাতে এতদিন কিছু ছিল না! আজ রাধা একটা টাকা দিযে আপনার এখানে জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলে।

কথা বলতে বেশ কষ্ট হ'চ্ছিল বুঝতে পেরে সমর বললে, থাক, তোমায় আর কিছু ব'লতে হবে না। ওই বেঞ্চিটায় শুয়ে পড়।

মেয়েটি যেন এতক্ষণ সমরের এই একটি কথার অপেক্ষাতেই ছিল। তখুনি শুয়ে পড়ল। সমর চেয়ার ছেড়ে উঠে তার নিকটে গেল। তাকে মাথার কাপড় খুলে ফেলবার অনুমতি দিয়ে সে বললে, ডাক্তারের কাছে লজ্জা ক'রতে নেই।

শিথিলপ্রায় হাতখানা উঁচিয়ে মেয়েটি ঘোমটাটা নামিয়ে নিলে। ঘোমটার আড়াল খুলে যেতেই বেরিয়ে পড়ল একখানা সুন্দর পাণ্ডুর মুখ। চোখের কোণে ঘন মসীময় রেখা। সারা অবয়বে সুস্পষ্ট ক্ষীণ সৌন্দর্য্যের প্লাবন। সমর তাকে ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রলে। রোগের আগাগোড়া সমস্ত বিবরণই জেরায় আদায় ক'রে নিলে। অনিয়মের দারুণ কষাঘাতে তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ ক'রলে অনায়াসে সে বেঁচে উঠতে পারে। কোন রোগী মরে: সমরের তা ইচ্ছা নয়। সহসা সে প্রশ্ন ক'রলে মেয়েটিকে, আচ্ছা, তুমি যা-তা খাও, না?

মেয়েটি কোন কথা বলতে পারলে না, অন্যদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলে।

—আমার কাছে সত্য গোপন ক'রে কোন ফল হবে না। সমস্ত বিষয় আমাকে না জানালে রোগের চিকিৎসা করা চলবে না। ভয় নেই, আমাকে সব খুলে বল: শিগগিরই তোমাকে ভাল ক'রে তুলব।

মেয়েটি এইবার একটুখানি মাথা দোলালে।

সমর নিজের মনেই মাথা নেড়ে তাকে জানালে, যদি বাঁচতে চাও, ও জিনিষটা তোমাকে ছাড়তে হবে।

মেয়েটি চুপ ক'রে রইল।

—চব্বিশ ঘণ্টা শুয়ে থাকতে হবে। বুঝলে? নইলে ওষুধ খেয়েও কোন ফল হ'বে না।

মেয়েটির মুখ যেন কালো হ'য়ে গেল। এ যাত্রা বাঁচা বোধ হয় তার আর হ'ল না। চব্বিশ ঘণ্টা নিরুপদ্রবে শুয়ে থাকবার মতোন কপাল

নিয়ে তো জন্মায়নি সে! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাকে সংস্থানের উপায় খুঁজতে হবে। তার পক্ষে মরা যত সহজ, বেঁচে থাকা তত কঠিন।

সমর তার পাশ থেকে উঠে অলস ভাবে নিজের চেয়ারে এসে বসল। এই শ্রেণীর নারীদের পানে তাকালে কেমন যেন তার মমতার উদ্রেক হয়। দুঃখের দিনে ওদের কেউ নেই। ওরা যেন রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকার। মানুষের কাছে ওরা ভয়াবহ, অকৃতজ্ঞ: সমাজের চোখে ওরা বিশ্বাসঘাতক: তাই ঘনান্ধকারের আবর্ত থেকে ওরা সহজে বেরিয়ে আসতে চায় না আলোর উৎসে। ওর দুর্দ্দশা চরম সীমায় এসে পৌচেছে ব'লেই ও আজ গণ্ডীর সংকীর্ণ সীমা ভেদ ক'রে বাহিরে আসতে সাহসী হ'য়েছে। হয়ত ও বুঝতে পেরেছে যে, এই ভাবে থাকলে তাকে অনিবার্য্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রতে হবে। মনে কত বিশ্বাস নিয়ে ডাক্তারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ওষুধ খেলেই সেরে উঠবে। তাই মরতে মরতেও এসেছে।

মেয়েটি আঁচলের খুঁট থেকে একটি টাকা বের ক'রে টেবিলের একাংশে রেখে বললে, আর আমার কিছুই নেই ডাক্তারবাবু।

সমর রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললে, ও টাকা আমি চাই না; তুমি রেখে দাও। বরং ঐটে দিয়ে কিছু ফল-টল কিনে নিয়ো।

মেয়েটি বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে চেয়ে রইল।

অনেকগুলো মুহূর্ত্ত কেটে গেল নিঃশব্দে। সমর খবরের কাগজের ওপর চোখ রেখে হয়তো ওদের জীবনযাত্রার কথাই ভাবছিল। ভাবছিল, কত সুখ, কত দুঃখ ওদের জীবনের ওপর দিয়ে অবলীলাক্রমে চলে যায়, ওরা তা ভ্রূক্ষেপের মধ্যেও আনে না; ভেবেও দেখে না কোনদিন। ওরা মনে করে: রোজই এম্নি ক'রে সূর্য্য উঠবে; এম্নি ক'রেই আবার ডুবে যাবে। ওদের জীবনে

রক্তরাগের ছোঁয়াচ অমলিন রইবে চিরদিন। সহসা মিঃ গুপ্টার অনাবশ্যক আগমন সমরকে বাস্তবের মধ্যে ফিরিয়ে আনলে। যথারীতি আপ্যায়িত ক'রে সে তাঁকে বসালে অন্তরের বিতৃষ্ণা অভিব্যক্তি না ক'রে।

মিঃ গুপ্টা একটা সিগ্রেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললেন, পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই দেখা ক'রতে এলাম।

মেয়েটি অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠল। লম্বা হ'য়ে শুয়েছিল, ধীরে ধীরে উঠে জড়সড় হ'য়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসল। মিঃ গুপ্টা তার দিকে কটাক্ষ হেনে একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে দিলেন।

—ওঃ, ধন্যবাদ বসুন। সমর আর কোন কথা না ব'লে কাগজের মধ্যে ডুব মারতে চেষ্টা ক'রলে।

ভৃত্য ওষুধ টেবিলের ওপর রেখে ভেতরে ঢুকে গেল।

সমর মেয়েটিকে উদ্দেশ ক'রে বললে, চার ঘণ্টা অন্তর এইটা খেয়ে যাবে। তারপর ওষুধের শিশিটা তার হাতে দিতে গিয়ে টাকাটা যথাস্থানে দেখে বললে, টাকাটা এখনো নাওনি কেন? তুলে নাও।

মেয়েটি কম্পিত হস্তে টাকাটি কুড়িয়ে নিলে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বে।

সাম্নেই গুপ্টার মোটার দাঁড়িয়েছিল।

মেয়েটি অতি সন্তর্পণে বেঞ্চি থেকে উঠে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল কিন্তু পথ চলার অক্ষমতা তার প্রতি পদে পদে প্রকাশ পেলে। খানিকটা গিয়ে সে থর্‌থর্‌ ক'রে কেঁপে ব'সে পড়ল। সমর উঠে গিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে। মিঃ গুপ্টা সমরের দেখাদেখি ওকে মদত দেখাতে এগিয়ে গেলেন। অনুকম্পায় নিজের মোটারে তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবার অভিলাষও ব্যক্ত ক'রলেন। উন্মুক্ত অন্তরের পরিচয় পেয়ে সমর তাঁকে বারকয়েক ধন্যবাদ জানালে। মোটার মেয়েটিকে নিয়ে ছেড়ে দিতেই সমর একটা স্বস্তির নিশ্বাস

ত্যাগ ক'রে সোজা হ'য়ে বসল। অনেকখানি দুশ্চিন্তার হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পেলে এতক্ষণে।

বিকালের রৌদ্র আকাশের গায়ে ঝলমল ক'রছিল। সাইডিং-এর ওপারেব লাল রঙের দোতালা বাড়ীর ছাদে মেয়ে দু'টি হাওয়া খেতে উঠেছে এরিমধ্যে। সামনের পোড়ো জমিটায় পাড়ার ছেলেরা সমবেত হ'য়ে মার্ব্বেল খেলায় মেতে উঠেছে।

সমর অনাদি মুখুর্জ্যের বাড়ী থেকে ফিরে এসে দেখলে শিবনাথ একাকী ডিস্‌পেনস্যারীতে বসে। তাড়াতাড়ি সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে সে এগিয়ে গিয়ে বললে, একটা কথা আপনাকে বলবার জন্যে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিলাম।

গোপনীয় বার্ত্তার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়ে শিবনাথ কেবল তার মুখের পানে নিরুদ্দেশ দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে রইল।

—আচ্ছা বলতে পারেন শিবনাথবাবু, গুপ্টা হঠাৎ কেন ডুব মারলে? তার কারণ নয়, আমি মোটার কিনব না বলে। আমার তো মনে হয় কারণ আরো জটিল। দিন পনেরো আগেকার কথা। আমার এখানে এক পেসেণ্ট্ এসেছিল। একমাস ক্রমাগত ভুগে ভুগে তার চলবার সামর্থ্য ছিল না। কোনো প্রকারে সে এসেছিল এই পর্য্যন্ত। ফিরে যেতে সে আর পারলে না। গুপ্টা এসেছিল তখন।······

শিবনাথ একটা সিগ্‌রেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবেন? বসুন।

সমর নিজের চেয়ারখানা টেনে এনে সেদিনের সমস্ত ঘটনা আদ্যপান্ত ব'লে চুপ ক'রলে।

শিবনাথ শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল।

—তারপর থেকে গুপ্টাও আর আসেনা: মেয়েটিরও দেখা সাক্ষাৎ আর নেই। কাজেই গুপ্টার সম্বন্ধে সাবধান থাকবেন। সেদিনকার কথাবার্ত্তায় বুঝেছি লোক হিসাবে সে মহা ঝাম্নু।

কিন্তু 'যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যে হয়' কথাটির সত্যতা প্রতিপন্ন ক'রে ঠিক মুহূর্ত্তে বিচিত্র ভঙ্গিতে মিঃ গুপ্টার আবির্ভাব। শিবনাথকে দেখতে পেয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, হ্যালো শিবনাথবাবু,—ক'দিন থেকে আপনাকে আর ধরতেই পারছি না। কোথায় থাকেন বলুন তো আজকাল!

শিবনাথ একটুখানি হেসে উত্তর দিলে, বাড়ীতেই থাকি। যাব আর কোথায়?

—আপনার উড়ে চাকরটা একেবারে ওয়ার্থলেশ। জিজ্ঞেস ক'রলে একটাও জবাব দিতে পারে না।

—জবাব দেবে কি? আপনাকে দেখেই তো ঘাবড়ে যায়।

—আজ কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হ'যে খুব ভাল হয়েছে। শিবনাথের পাশে উপবেশন ক'রে মিঃ গুপ্টা বললেন, আপনার তো বিশেষ কিছু এখন করবার নেই?

শিবনাথের ঘুরে বেড়ানই কাজ। পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থের উত্তরাধিকারী সে একা।

—তাহ'লে চলুন, একটু গান শুনে আসি।

সমর শঙ্কিত হ'য়ে উঠল। শিবনাথ গান শুনতে ভালবাসে এবং নিজেও গাইয়ে। হতভাগাটা তার দুর্ব্বলতা জেনে নিয়েছে। এই সূত্রের টানে হয়তো তাকে নরকে নাবিয়ে নিয়ে যাবে।

মধ্যে সমরের চাকর চা নিয়ে এল। সমর কেৎলী থেকে ঢেলে প্রত্যেককে দিয়ে নিজেও নিলে। শিবনাথ সিগ্রেট ধরালে।

সিগ্‌রেটের সঙ্গে চা খেতে তার বেশ লাগে: মোটের ওপর সে খেয়ে তৃপ্তি পায় প্রচুর। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে বেশ একটা নীরবতা সৃষ্টি হ'য়ে উঠল। আচমকা মিঃ গুপ্টা বললেন, আপনাকেও যেতে হবে ডক্টর সুব।

সমব বললে, ওস্তাদের মুখ ভঙ্গীর ভয়ে সাম্নাসাম্নি আমি কারুর গান শুনি না। রেডিও-ই আমার একমাত্র ভরসা।

—ভাল না লাগে চলে আসবেন।

—সময় কাটান নিয়ে কথা তো—শিবনাথ পোড়া সিগ্‌রেটটা রাস্তায় ছুঁড়ে দিয়ে বললে।

—মনের ওপর জুলুম চলে না শিবনাথবাবু। একদিন গানের মজলিসে গিয়ে কি মুস্কিলেই পড়েছিলুম! সে কথা আজো ভুলিনি। গেলুম তো ফণীবাবুর পাল্লায় পড়ে। গিয়ে দেখি এক ছোকরা তানপুরা নিয়ে বিরাট চীৎকার আর বিশ্রী মুখ খিঁচিয়ে একটা বীভৎস রসের সৃষ্টি ক'রে তুলেছে। আসে পাশে তার অজস্র লোক মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা ক'রছে। হাঁপিয়ে উঠলুম তার গানের ঠেলায় কিন্তু নিস্তার পেলুম না আমার নিকটের বন্ধুটির জেদে। সেই দিন থেকে পণ করেছি; বৈঠকী গানের আসরে আর কোনদিন যাচ্ছি না।

—আমি যার কাছে নিয়ে যাব, রেকর্ডে তার বিস্তর গান আছে। তার গান শুনে এ পর্য্যন্ত কাউকে নিরাশ হ'তে শুনিনি। আর তাছাড়া কি জানেন, এই সিক্তা দেবী যেমন ঠুংরী, খেয়ালে ওস্তাদ তেম্নি আবার আধুনিক গানে ওর জুড়ি নেই। বুঝতেই তো পারছেন, ওদের সব রকমই শিখতে হয়। সেদিন মোটার ক্যানভ্যাস্‌ ক'রতে গিয়ে আলাপ হ'য়ে গেল। সেই সূত্রে একদিন গান শোনবার কথা পেড়ে ফেললুম। দেখলুম, এতে সে অসন্তুষ্ট নয়: বরং আগ্রহ-ই দেখালে। সেখান থেকেই এখন আসছি। যদি যেতে চান, এইবেলা উঠতে-

হবে। নিজের ঘড়ির পানে তাকিয়ে নিয়ে মিঃ গুপ্টা পুনরায় বললেন, আটটার সময় তাকে টাইম্ দিয়ে এসেছি। আজ না হ'লে আবার কিছুদিন ওয়েট্ ক'রতে হবে। দু'এক দিনের মধ্যেই সে পুরীর সাইডে চলে যাবে। সেখানে ওদের ছবির সুটিং নেওয়া সুরু হবে।

সিপ্রা দেবীর মীরার ভজনটা রেকর্ডে শিবনাথ বহুবার শুনেছে: লেগেওছে ভাল। তাই সে না ক'রলে কোন প্রতিবাদ: না দেখালে এতটুকু ব্যাকুলতা। কিন্তু সমর যখন এই দেবীর বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করার প্রস্তাবে বিদ্রূপ ক'রে নিজের মতামত জানালে, সে উদ্দাম আগ্রহকে আর চেপে রাখতে না পেরে বলে উঠল, ওর বাড়ীতে না হ'য়ে যদি কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাড়ীতে মজলিশ বসত কিম্বা যদি অন্য কোথাও টিকিট বেচে ওর গানের ব্যবস্থা হ'ত। যেতে হয়তো আপত্তি ক'রতেন না।

—আমি তো সেজন্যে যাচ্ছি না। যে কাজে নেমেছি, তা'তে যমের বাড়ী হ'লেও যেতে হবে। কিন্তু—সমর কথাটা আর শেষ ক'রলে না। সে বেশ বুঝতে পেরেছে একটা আকর্ষণী শক্তিকে উত্তেজিত ক'রিয়ে গুপ্টা দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ নেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। লোক চরান তার পেশা নয় কিন্তু লোক চরিত্রের অভিজ্ঞতা এই ক' বছরে কম হয়নি। নিজে সে যেতে চায় না: শিবনাথকেও আগুনের মুখে ঠেলে দিতে চাইবে না।

মিঃ গুপ্টা এতক্ষণ মেঝেতে জুতার মৃদু শব্দ ক'রে কোন অগীত গানের তাল দিয়ে চলেছিল। এইবার সেটা থামিয়ে দিয়ে বললেন, আপনারা না গেলে আমাকে একাই যেতে হবে। অমন চার্মিং গান আমি ছাড়তে পারি না। আটটা বাজল...উঠি। আর দেরী না ক'রে মিঃ গুপ্টা নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লেন।

শিবনাথ ম্রিয়মান হ'য়ে বসে রইল।

তবু সমরের আনন্দ হ'ল। বন্ধুর দিকে ঝুঁকে পড়ে সে বললে, আপনাকে যেতে আমি কিছুতেই দিতুম না শিবনাথবাবু। ঠিক গান শোনান ওর মতলব না হ'তেও পারে। আমাদের নারীর মোহে বশ করানই ওর উদ্দেশ্য।

সমর কথাগুলো বলে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

শিবনাথ এ কথার কি উত্তর দেবে ভেবে পেলে না।

অন্ধকার রাত। একটু একটু শীতও পড়েছে। সারাদিন সমরের খাটুনি গেছে আজ ভীষণ। একটা কল্ ছিল, কেশ্‌টা তত সিরিয়াস্ নয়; কাল দেখলেও চলতে পারে। সে বেরুবার সঙ্কল্প ত্যাগ ক'রে বার্ণাড শ'য়ের একখানা নাটক সেল্‌ফ্ থেকে টেনে বের ক'রলে। সকাল থেকে সে এর একটা পাতাও ওল্টাবার অবসর পায়নি। এই ফাঁকে সে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। পোষাক ছেড়ে এসে সে গ্যাঁট্ হ'য়ে বসল। শরীরের অবসন্নতা ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা সে বিনষ্ট ক'রে ফেলতে পারবে এই সুযোগে। কয়েকপাতা নির্ব্বিঘ্নে শেষ করবার পর তার মধ্যে কেমন শিথিলতার ভাব এসে দেখা দিল। সে বইখানা মুড়ে উঠে পড়বার উদ্যোগই ক'রছিল, হঠাৎ কোথা থেকে মিঃ গুপ্টা এসে হাজির। এখুনি তাকে যেতে হবে। গাড়ী পর্য্যন্ত সে সঙ্গে এনেছে।

সমর বললে, মাপ ক'রবেন মিঃ গুপ্টা, এখন কোথাও যেতে পারব না। আপনি বরং কাল ভোরেই আসবেন।

মিঃ গুপ্টা অনেক কাকুতি মিনতি জানালেন। শেষে যখন তিনি বললেন, নৈহাটীর সমস্ত ডাক্তারকেই দেখান হ'য়েছে। কেউ কিছু ক'রতে পারেনি। হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করাবার আগে আপনার

চিকিৎসাই বা বাকী থাকে কেন? এই ভেবে আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

সব ডাক্তার যেখানে হার মেনেছে, সেখানে নিজের গৌরবকে যদি দাঁড় করান যায়, মন্দ কি? শেষ পর্য্যন্ত সমর রাজী না হ'য়ে পারলে না।

গাড়ীতে যেতে যেতে সমর রোগের যাবতীয় বিবরণ জেনে নিলে। নৈহাটী ষ্টেশন পেরিয়ে গাড়ী চলল পশ্চিম দিকে একটা জঘণ্য পল্লীর মধ্যে দিয়ে। দোতালা একখানা বাড়ীর সাম্নে গিয়ে ঘোড়া দুটো হঠাৎ থামল। মিঃ গুপ্টা সাদরে তাকে ওপরের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। একটি মেয়ে সেই ঘরের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদে অব্যক্ত যন্ত্রণাকে প্রকাশ ক'রছে।

মিঃ গুপ্টা মেয়েটিকে সম্বোধন ক'রে বললেন, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

মেয়েটি অতি কষ্টে যেন পাশ ফিরলে।

সমর এগিয়ে গিয়ে বললে, না, না আপনাকে নড়তে হবে না। এতে পেন বেড়ে যেতে পারে। তারপর শুভ্র বিছানার একাংশে বসে নানা প্রশ্নে তাকে অস্থির ক'রে তুললে।

অবগুণ্ঠনে গুণ্ঠিতা অপরিচিতার মুখখানি এইবার একটুখানি উন্মোচন হ'ল। সমর যেন চমকে উঠল। সেদিনকার সেই পরিচিত মুখ। রোগা, বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, মলিন, একক একখানি মুখ।

মেয়েটি বললে, ডাক্তারবাবু, আমাকে বাঁচান।

সমর গরম জলের ব্যবস্থা করবার আদেশ দিলে। খানিক পরে একটি তরুণী গরম জল নিয়ে উপস্থিত হ'ল। তাকেই তল পেটে সেঁক দিতে বলে সমর পাশের ঘরে অপেক্ষা ক'রতে লাগল।

মিঃ গুপ্টা বললেন, কারণটা অনুমানে ধরতে পেরেছেন কি?

—হ্যাঁ। সমরের মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না।

—ভয়ের কিছু নেই তো ডক্টর স্যর? অস্বাভাবিক একটা উৎকণ্ঠা মিঃ গুপ্টার স্বরে প্রকাশ পেলে।

সমর কথাটা শুনেও যেন শুনলে না। আপন মনে কি যেন সে ভাবতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক এম্নি ক'রে কেটে যাবার পর সমর বললে গুপ্টাকে, ব্যথাটা ক'মলো কি না খোঁজ নিয়ে দেখুন দিকি? নইলে আমাকে অন্য ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

মিঃ গুপ্টা তড়িৎ বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সমর এখনো ঠিকমত বুঝতে পারছে না, ঘটনাটার আগাগোড়া সাজান কিনা? হয়ত এই কুট কৌশলের দ্বারা জড়িয়ে ফেলাই ওদের দু'জনের সঙ্কল্প। কিন্তু কেন ওরা তা চাইবে? এম্নিভাবে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে আসবারই বা অর্থ কি? এতে ওদের লাভ-ই বা কতটুকু? পৃথিবীতে এত লোভনীয় প্রাণী থাকতে এই একটি মাত্র প্রাণীকে জব্দ করবার জন্যে ওদের আত্মা এত লালায়িত কেন? কেন?...কেন? এর উত্তরই বা কি হ'তে পারে?

হঠাৎ সেই মেয়েটি তার সাম্নে এসে দাঁড়াল।

—তুমি উঠে এলে কেন? প্রশ্ন ক'রলে সমর।

মেয়েটি সাম্নের চেয়ারখানা দখল ক'রে বললে, জীবন হ'য়ে উঠেছে অসহ্য। বেদনার পাহাড় বুকখানা ভারী ক'রে রেখেছে। এ থেকে অব্যাহতি আমার নেই, না মরা ছাড়া।

গত-লাবণ্য মেয়েটির প্রতি করুণায় সমরের সমগ্র ইন্দ্রিয় বেপথুমান হ'য়ে উঠল। যেন দূর অতীতের একটি ম্লান ভাস্কর্য্যের সাম্নে দাঁড়িয়ে তার বাক রোধ হ'য়ে এল।

—আপনার দানের কথা আমাকে অহরহ যন্ত্রণা দেয়। এম্নি

অকৃতজ্ঞ আমি যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা পর্য্যন্ত জানাতে পারিনি। কতদিন ভেবেছি যাব কিন্তু যেতে সাহস পাইনি।

—তার দরকার ছিল না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না : আগে সেরে ওঠ।

—সেদিন আপনি গান শুনতে আসবেন না, তা আমি আগেই জানতুম। তাই ছল ক'রে আজ আপনাকে ধরে এনেছি।

সূর্য্য উঠল যেন সমরের সায়ে।

—আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না ডাক্তারবাবু। ভালবাসতে আপনাকে বলি না। ঘৃণার চোখেই দেখবেন; কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে আসবেন। আপনাকে দূর থেকে শুধু দেখব। সেই হবে আমার সকল পাওয়া : আমার শ্রেষ্ঠ নিবেদন আপনার কাছে।

মেয়েটির ইঙ্গিতে পূর্ব্বের সেবারতা তরুণীটি নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সমরের সম্মুখে উপস্থাপিত ক'রলে।

মেয়েটি ট্রে থেকে সবগুলো নামিয়ে বললে, এগুলো আপনাকে খেতে হবে।

খেতে হবে? মনে মনে উচ্চারণ ক'রে সমর বললে, আমি খেয়ে এসেছি। আর তাছাড়া এত রাত্রে আমি কিছু খাই না।

—না। তা বললে শুনব না। অন্ততঃ কিছুও খেতে হবে।

অনেক পীড়াপীড়ি, বিস্তর অনুনয়-বিনয়ের পর সমর কেবল চা-টুকু খাবার সম্মতি জানালে।

—কাল আমার গান শোনবার নিমন্ত্রণ রইল। আপনার আসা চাই। অতর্কিতভাবে মেয়েটি বললে।

সমর নিরুত্তর।

—এখানে না আসেন, ষ্টুডিওতে যাবেন। আমি কি এতই অস্পৃশ্য যে আমার ছায়া মাড়ানও পাপ। আপনার ঋণ পরিশোধ

করা যায় না ; তবুও কথঞ্চিৎ যদি পারি, সেই হবে আমার সব চেয়ে বড় সম্বল : আমার ব্যর্থ জীবনের সার্থকতার পুজো।

মেয়েটি কি ভেবে দাঁড়িয়ে উঠল।

পাশের বাড়ীতে হুল্লোড়ের শব্দ তুমুল থেকে তুমুলতর হ'য়ে উঠেছে। এখানে আর তিষ্ঠানো দায়।

সমর কোন কথা না বলে উঠে পড়ল।

—আমাকে অপরাধী ক'রে যাবেন না ডাক্তারবাবু। পাপ করেছি ঢের, নতুন পাপ আর ক'রব না : অপরাধের বোঝা আর বাড়াব না। আপনার কাছে দেহের চিকিৎসা করাতে গিয়ে মনের চিকিৎসা করিয়ে এসেছি। সত্যিকারের রোগ আমার ছিল না। আমরা অভিনেত্রী : গুপ্টার পরামর্শে আপনাকে অভিনয়ে আকর্ষণ ক'রতে গিয়েছিলাম। অনেকদিনের আলাপি বন্ধু, মোটার গচান'র তার সুবিধে হবে ব'লে। কিন্তু আপনার চেহারার সঙ্গে আর একজনের চেহারার সাদৃশ্য দেখে চমকে উঠেছিলাম। তার নাম আজ আর আমার মুখে আনবার অধিকার নেই, সে আমার পরলোকগত স্বামী। জিৎতে গিয়ে হেরে ফিরে এলাম কিন্তু আপনাকে ভুলতে পারলাম না, ভুলও বুঝিনি—

সমরের পা যেন টলতে লাগল। আর সে শুনতে পারলে না, কোনদিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে সে হন্ হন্ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রাস্তায় গুপ্টা নেই কিন্তু গাড়ীখানি তখনো দাঁড়িয়ে আছে। সমর শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গাড়ীতে উঠে বসল।

গাড়ী তখুনি ছেড়ে দিল।

ভগবান নেই

সতী গৃহত্যাগ ক'রেছে :

কথাটা সকালে সংক্রামক রোগের মতো গ্রামময় ছড়িয়ে পড়ল। তের থেকে তিপান্ন কারু মুখে আজ আর অন্য কথা নেই। সকলেই কৌতূহলী মন নিয়ে চড়কডাঙার মাঠে এসে সমবেত হ'ল আসল ব্যাপারখানা কি তারই সঠিক বর্ণনা নিজের কানে শোনবার আশায়। মানুষের চিরন্তন ইতিহাসে এ কাহিনী নতুন নয় : পৃথিবীর প্রতি পৃষ্ঠায় এই কলঙ্কের দাগ চিহ্নিত হ'য়ে আছে। তবু উদগ্র আগ্রহ : তবু অস্ফুট আসক্তির ক্রমবিকাশ। পশুপতির স্ত্রী সতী : এ'দের আর যাই হোক, গৃহত্যাগিনী হবে ; একথা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি আবার অশ্লীল। তাই চড়কডাঙার মাঠে তিল ধরণের জায়গা ছিল না। মাঠের পূব দিকে পশুপতির সাতপুরুষের বাস্তুভিটে। পশুপতির উদ্ধতন পুরুষের যজমানি ক'রেই দিন কেটেছে। এইরূপ জনশ্রুতি-ই গ্রামে প্রচলিত। তাঁদের আশাও ছিল না : আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। এককালে ন্যায়নিষ্ঠ সদ্ব্রাহ্মণ বলতে গ্রামের মধ্যে এই একটি পরিবারকেই বিশেষ ক'রে বোঝাত। যে-সুনাম, যে-প্রতিপত্তি তাঁরা বংশধারাকে পর্যায়ক্রমে দিয়ে গেছেন, পশুপতির ঠাকুর্দার আমলেও সে-সুখ্যাতি অটুট ছিল। তিনি ভাটপাড়ার টোলে অধ্যাপনা ক'রতেন। পণ্ডিত হিসেবে খুব নাম-ডাক ছিল শ্যামাকান্ত বাচস্পতির। তাঁর বংশধর নিশিকান্ত বংশের চিরাচরিত প্রণালী প্রথম লঙ্ঘন করেন কলকাতার এক সওদাগরী আফিসে মোটা মাইনের চাকুরীতে

ঢুকে প'ড়ে। তাঁর ছেলে পশুপতির যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মাবে—এতে কারুর আশ্চর্য্য হবার কারণ ঘটেনি। বংশানুক্রমিক এই অবনতির ইতিহাস গ্রামের বৃদ্ধ সনাতন ঘোষাল জানেন আর জানেন তাঁর সমবয়সী নরহরি চাটুর্য্যে।

সনাতন ঘোষালের মুরুব্বিয়ানা গলা শোনা গেল, তাই তো চাটুর্য্যেমশাই, শেষ পর্য্যন্ত এ-ও দেখতে হ'ল!

নরহরি চাটুর্য্যে বসান দিলেন, ছুঁড়িটার স্বভাব-চরিত্তির বরাবরই ওইরকম। আন্নার মা আমার কতদিন একথা বলেছে। আমি বরং ঘোষালমশাই তার কথায় কাণ দিতুম না। শহুরে মেয়েরা ওরকম হ'য়েই থাকে। সৌরেনের বৌকে তো দেখেছেন? প্রথম যখন সে আসে, গ্রামময় ঢি-ঢি প'ড়ে গেল। বৌ নয় তো যেন লালবাজারের মেম। তোয়াক্কার বালাই ছিল না। দিব্যি গটমট ক'রে জুতোর আওয়াজ ক'রতে ক'রতে হাওয়া খেতে বেরুত। বিলিতি ঢংয়ে কাপড় প'রে বাগানে নভেল নাটক নিয়ে বসত। ওকে দেখে কে বলবে যে চৌধুরী বাড়ীর বৌ। আমরাও তো দেখেছি ঐ বাড়ীর বৌয়েদের! ওর মত আর কে ছিল? দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা আর কি? গলাটা ঘড়ঘড় ক'রে উঠল। বারকয়েক কেশে তিনি পুনরায় বললেন, অমন যে, রায়-বাঘিনী জমিদারের বৌ সে-ও ঢিট হ'ল। ভেবেছিলুম, সতীরও আর বেশী দিন নয়। ও তেজ শীগগিরই ভাঙবে। কিন্তু ও ছুঁড়ি কিছুতেই বাগ মানলে না। তিন বছর এখানে ছিল, একদিনো আন্নার মার সঙ্গে হেসে একটা কথা কইলে না! অমন যে মুখুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে একমাস ধরে রামায়ণ পালা হ'ল, শুনতে পাওয়া যায়, কোনদিন ভুলেও সে চণ্ডীমণ্ডপ মাড়ালে না। বামুনের ঘরে এত অনাসৃষ্টি ঠাকুরদেবতা সইবে কেন?

কথা কইবার ক্ষণ আজ সমুপস্থিত। এমন সুযোগ কস্মিকু জীবনে

তাঁদের এই প্রথম। কত রোমাঞ্চ, কত শিহরণের আমেজ, কত পুলকের আস্বাদন যে তাঁদের প্রতি কথায় আজ ঝরে পড়তে লাগল তা' চডকডাঙার সেই পোড়ো জমিটায় না গেলে তার সম্পূর্ণ রস উপলব্ধি করা সম্ভবপর হবে না।

সকলেই নানা আলোচনায় ব্যস্ত। অমন যে রাধিকাবাবুর স্ত্রী —সতীর প্রিয় বান্ধবা; সে-ও আজ মুখরা হ'য়ে উঠেছে। পাশের সঙ্গিনীটিকে বলছে, মাগো, সতীর পেটে পেটে এতও ছিল!

পাশের সঙ্গিনীটি জানালে, সত্যি ভাই বৌদি, সতীদি যে বংশে এম্নি ক'রে কালি লেপে দেবে, কে ভাবতে পেরেছিল?

—আহা-হা, তুই যেন কিছুই জানতিস নে! তোর ন্যাকামি শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়। দেখিস নি একদিনো সেই যে কলকাতার একটি বাবু প্রায়ই ওর কাছে আসত।

—সে তো শুনেছি, ওর কি রকম ভাই হ'ত।

—ভাই হ'ত না হাতী হ'ত। ঐরকম একটা সম্বন্ধ না পাতালে বাড়ীতে ঢোকাবে কোন সাহসে? তুই যেন একেবারে ন্যাকা। কথার আঘাতে সঙ্গিনীটিকে বোবা ক'রে দিয়ে রাধিকাবাবুর স্ত্রী বলতে আরম্ভ ক'রলে, লোকটাকে দেখে কিন্তু একটুও অন্য রকমের বলে মনে হয় না। একদিন দুপুরে গিয়ে দেখি কলকাতার সেই বাবুটি রয়েছে। দু'জনে ফিসফিস ক'রে কি কথাবার্ত্তা কইছিল, আমাকে দেখে থামিয়ে দিলে। সতী আমাকে ভোলাতে এল। বললে, তাইতো ন-ঠাকুরঝি, বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি। সুধীরদা থিয়েটারের পাশ পেয়েছে, নিয়ে যেতে চায়—অথচ উনি মত দিচ্ছেন না। বলবে ভাই আমার হ'য়ে। তোমার কথা উনি সহজে ঠেলে দিতে পারবেন না। আহা-হা, সংসার থেকে একেই তো ও কোথাও বেরুতে পায় না। আমি বললে যদি ওর যাওয়া হয়, বল না

ভাই, বলতে আর আমার কি? সাধ-আহ্লাদ তো সবাইয়েরই আছে। তখন কি ছাই জানতে পেরেছিলুম যে ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড—

সঙ্গিনীটি অতর্কিতে বলে উঠল, আঃ গেল যা! মরণ আর কি? একটা নধর কুকুর বাচ্চা তার পায়ের গোড়ায় ধুপ ক'রে এসে বসে পড়ল। পাখানাকে জোরে ছুঁড়ে দিয়ে আতঙ্কে একটু দূরে সরে গিয়ে সে বললে, দেখদিকিন কি গেরো! যাই, একটা ডুব দিয়ে আসি। আপন মনে বিড়বিড় ক'রে বকতে বকতে সত্যিই সে রায়েদের পুকুরের দিকে চলল।

মদন সতীর গৃহত্যাগের কথা শুনেও বেরোয়নি। এতক্ষণ সে অন্দরে পাহারা দিচ্ছিল। ফটিক তাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে এল। আসবার তার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সুরেশের ন্যায় যদি তাকেও স্ত্রৈণ ব'লে ক্ষেপাতে সুরু করে, সেই ভয়ে সে সুড্‌সুড়্‌ ক'রে বেরিয়ে এল।

ফটিক সজনে গাছের আবডালে লুকিয়ে বিড়িতে টান দিয়ে বললে, তোকে বলিনি মদন, গ্রামে ও কিছুতেই টেঁকে থাকতে পারবে না। যার স্বামীর ঐরকম অবস্থা, তার অতো দেমাক কিসের? হুঁ, হুঁ বাবা, সেদিন তো খুব হেসেছিলি? গরীবের কথা বাসি না হ'লে কি মিষ্টি লাগে রে? মুরুব্বিয়ানা চালে সে বিড়িতে জোরে আর একবার টান মারলে।

মদন গত বোশেখে বিয়ে ক'রেছে এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ শহুরে মেয়েকেই। তাই সতীর এই আকস্মিক অন্তর্দ্ধান উপলক্ষে সে এতদূর বিস্মিত হ'য়ে পড়েছে যে মুখ দিয়ে তার একটাও কথা বেরুল না।

দুলুও হুজুক শুনে বেরিয়ে এসেছে। শিবু হাঁ ক'রে সকলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তাকে দেখতে পেয়ে চুপি চুপি সে জিজ্ঞেস ক'রলে, কি হ'য়েছে রে শিবু?

শিবু বললে, কা'কে যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ডুলু বললে, সন্ধ্যেবেলায় দেখবি ঠিক ফিরে আসবে। আমাদের সাদা গোরুটা—

ডুলুর বাবা মাথায় একটা চড় বসিয়ে চোখ পাকিয়ে বললেন, এরিমধ্যে তোর পড়াশুনো সব হ'য়ে গেছে, হতভাগা ছেলে কোথাকার! যা শীগগির পড়তে বসগে যা। ভূগোল পড়া যদি দিতে না পারিস, তোকে আর আস্ত রাখব না।

ডুলু চলে গেল কিন্তু জনতা স্থির হ'য়ে রইল। যেন রথ-দোলের মেলা বসেছে। ভিন গাঁয়ের পথিক রাজিবপুরের হাটে যাবার পথে যে সমারোহ দেখে গেছে, ফিরতি পথে তেমনি জাঁকজমক দেখে অকারণে কিছুক্ষণের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে। তারপর মেলার কোন চিহ্ন না দেখতে পেয়ে আবার চলে যায়। শোভনমিঞা কিন্তু নড়ল না। সাত বছর সে এই পথ ধরে রাজীবপুরের হাটে আসছে, যাচ্ছে; কোনদিন এই বিশেষ স্থানটিতে এত লোক সমাগম দেখেনি। তাই আজকের এই ব্যাপারে কিছু অদ্ভুতত্বের সন্ধানে সে জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখনো তাকে দেড় ক্রোশ পথ ভেঙ্গে বাড়ী পৌঁছুতে হবে। ঠেঙাড়ের মাঠ পেরিয়ে নন্দীপুর ডিঙ্গিয়ে তবে পলাশপুর গ্রাম। এদিকে সূর্য্য পশ্চিমে হেলে পড়েছে। অপরাহ্ণের স্বর্ণচ্ছটা পাতার ফাঁক দিয়ে জায়গায় জায়গায় ঝিকমিক ক'রছে। এখুনি সন্ধ্যা নেমে আসবে জেনেও সে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। শোভনমিঞা মুসলমান; তাই বামুনপাড়ার মধ্যে ঢুকতে তার ভরসা হয় না। একবার এই পাড়াতেই কা'কে ছুঁয়ে ফেলেছিল ব'লে তাকে অনেকগুলো কিল-চড় খেতে হ'য়েছিল। সে-কথা সে ভুলবে না কোনদিন। সেই থেকে সে এই বিষয়ে সতর্ক হ'য়ে গেছে যথেষ্ট। কৌতূহলের বশবর্ত্তী

হ'য়ে অতীতকে সে পারদপক্ষে ভুলে যায় না। সনাতন ঘোষাল ও নরহরি চাটুর্য্যের কণ্ঠস্বর তার কাণে আসছিল। তাঁদের কথার ধরণে সে বেশ বুঝতে পারলে যে মেলা বসেনি। তবু উৎকণ্ঠা তার সমানই রইল। কিছুই নয়—হয়তো খাওয়ান-দাওয়ান হ'চ্ছে। বিয়ে-পৈতেও হ'তে পারে, পঞ্চায়েত বসাও আশ্চর্য্য নয়। এসব জেনেও সে মনকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে না। কোন মেয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে আর তার জন্যে এত ঘটা, এ কল্পনা করা তার পক্ষে কষ্টকর। এটুকু যদি সে আন্দাজে পূর্ব্বেই অনুমান করে নিতে পারত, হামকা এতখানি সময় নষ্ট হ'তে দিত না। পালিয়ে যাওয়াটা তার কাছে একেবারেই বিচিত্র নয়। তার এই সাতাশ বছর বয়সে সে অমন কত দেখেছে। বেশী কথা কি? তার নিজের স্ত্রী বসীরণ যেদিন রাত্রে পাঁচুমিঞার সঙ্গে পালিয়ে যায়, সেদিন কি তার উঠানটাতে আসপাশের গাঁয়ের লোক ভেঙ্গে পড়েনি? এমিধারা লোক জড় ক'রলেই যদি তাকে ফিরিয়ে আনা যেত, তাহ'লে বসীরণকেও সে ফিরিয়ে পেত।

রাস্তায় যেতে যেতে শোভনমিঞার মনে হ'ল বসীরণের মত কে যেন মাঠের ওপাশটায় ঘোমটার আড়ালে মুখখানি ঢেকে দাঁড়িয়েছিল। বসীরণ না হ'লেও অবিকল বসীরণের মত দেখতে। কতদিন সে তাকে দেখেনি। এখন ঠিকমত সে তার চেহারাটাকে ভাবতে পারে না। আর সেই অবগুণ্ঠিতা নারী যদি বসীরণই হয়, তার আনন্দে নেচে ওঠবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। একদিন ছিল বটে যেদিন তাকে দেখে সে জগতকে ভুলতে পারত। সে বসীরণও আজ নেই: সে শোভনমিঞাও আজ বদলে গেছে। তবু শোভনমিঞার মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি সে সত্যিই কোনদিন তার কাছে ফিরে আসে, সে কি ক'রবে তাকে? টুঁটি টিপে তাকে

মেরে ফেলবে, না আবার তাকে যেমন ভালবাসত তেম্নি ভালবাসবে। কি ক'রবে সে? কি তার করা উচিত? এ প্রশ্নের উত্তর সে বহুদিন খুঁজেছে: সরলভাবে সমাধান ক'রতে চেয়েছে কিন্তু মীমাংসার শেষ ক'রতে পারেনি কোনদিন। বসীরণের কথা ভাবতে ভাবতে সে অন্যমনস্ক হ'য়ে উঠল। শুনতে পাওয়া যায়, পাঁচুমিঞাকে সে নিকে ক'রেছে। তাদের একটা ছেলেও হ'য়েছে। কি নেকমহারাম ঐ জাতটা! শোভনমিঞাকে সে একেবারে ভুলে গেছে। অথচ শোভন-মিঞা কোনদিন তাকে অযত্ন করেনি। বরং সে বেশী ক'রেই তাকে ভালবাসত। তাকে বিয়ে করবার পর থেকে তার কপাল ফিরেছে ব'লে।

শোভনমিঞা সতীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠল ঠেঙাড়ের মাঠ পড়তেই। হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে সে চলতে সুরু ক'রলে। সন্ধ্যের অস্পষ্টতা ধূলি ধূসব তমিস্রায় ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে এরিমধ্যে। অন্যদিন এই সময়ের মধ্যে সে গ্রামে পৌঁছে যায়। জেরিণাকেও বাবলা গাছের তলায় ডিবে হাতে ক'রে স্বামীর প্রতীক্ষায় চঞ্চল আগ্রহে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। অনর্থক চডকডাঙার মাঠে সময় নষ্ট ক'বে এল ব'লে তার অনুতাপ হ'চ্ছিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে শিস দিতে দিতে সে এগিয়ে চলল। আলের রাস্তা আরম্ভ হ'তেই তাব শিস থেমে গেল। এইখানে—এই আলের ধারে রোজই বসীরণ তাব অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত। পথ চলার ক্লান্তিতা তার নিমেষে উধাও হ'য়ে যেত। জোর ক'রে তার একখানা কব্জি চেপে ধরে সে বলত, তোর ডর করে না বসীরণ এই তেপান্তরের মাটের মাঝে একলা দাড়িয়ে থাকতে?

—দূর! ডর ক্যেন ক'রবে? কদ্দূর হ'তে তোকে দেকতে পাই। তোর বুঝি চোক নেই?

– কে তোকে বললে? তোকে তো সেই দীঘির পার হ'তে ঠাওর হয়। শোভনমিঞা মুগ্ধ নেত্রে ওর মুখের পানে তাকিয়ে থাকত।

—আয় না, মাটে বসে' বসে' একটু গল্প করি।

দু'জনেই আলের পাশে নেমে যেত। শোভনমিঞা গামছাখানা বিছিয়ে দিত।

—তুই বুঝি আমাকে খুব ভালবাসিস? বসীরণ পাতা-গামছাখানায় বসে বলত।

—হুঁ।

—আমাকে পুছলি না?

—তুই বল না?

—হুঁ। তারপর ফিক ক'রে হেসে বলত, তুই কিসে বসবি?

—ভুঁইয়ে। আমাদের কি আর আল-কাঁটা ফুটলে কিচ্ছু হয়?

—ক্যেন রে? তোদের চামড়া বুঝি শক্ত?

নির্ব্বোধের মত শোভনমিঞা উত্তর দিত, হুঁ।

—নে, নে আর পিরীত দেখাতে হবে না। বসীরণ একপাশে সরে গিয়ে তার হাতখানায় হেঁচকা টান দিত। শোভনমিঞা হুমড়ি খেয়ে তার গায়ের ওপর পড়ে যেত। বসীরণ খিল খিল ক'রে হেসে উঠত। তারপর প্রেমের প্রাত্যহিক মহলার স্থচনা হ'ত।

শোভনমিঞা বলত, ঈদের পরবে তোকে জরি দেওয়া জুতা কিনে দোবো। তুই পরবি তো বসীরণ?

—করিমচাচার যদি চোক টাটায়!

—ও বুড়টাকে পোচে কে শুনি?

—তুই বড় নেমকহারাম। বুড়াটা ছিল ব'লেই তো তুই আমাকে সাদি ক'রতে পেরেছিলি।

শোভনমিঞা নির্ব্বাক হ'য়ে যেত।

বসীরণ আবার কথা পাড়ত, আমাকে তাবিজ গড়িয়ে দিবি ?

—দাড়া। আগে পাটগুলো বিক্রি করি।

—ঠিক দিবি তো! নন্দীপুরের সরকারদের দোকান হ'তে কিনে দিতে হবে। ওদের চাঁদি ভারি সাচ্চা। ওদের জিনিষ ভি খুব খাপসুরৎ।

—আর দু'টো মাস সবুর কর না! তোকে তাবিজ দোবো, মল দোবো। তুই ঘাবরাসনি—

—পাট বিক্রি ক'রে যদি না দিস তো আর একদিনো এই ঘাটে এসে দাড়িয়ে রব না।

—তুই আসিস ব'লেই তো সকাল-সকাল ফিরে আসি।

—হুঁ। আমার জন্মেই যেন তুই আসিস।

হাতের কব্জিখানা আরো চেপে ধরে শোভনমিঞা বলত, কশম খেয়ে কইছি। তোকে কতক্ষণ দেখিনি।

—যাঃ! আমাকে দেখবার লাগি যেন তুই আসিস। আমি বুঝি কিচ্ছু জানি নে।

—কি জানিস বল না ?

—ফগুয়ার দোকানে তাড়ি গিলতে যাবি না ?

—কোন্ শালা ফগুয়ার দোকানে ঢোকে ? তোর জন্মে মনটা কেমোন ক'রে উঠল তাই পানির দামে মুসুরিটা ছেড়ে দিয়ে এলুম। আরো খানিকক্ষণ ধরে রাখতে পারলে পনের সিকে বেকসুর বেচতে পারতুম।

—বেচলি না ক্যেন ?

শোভনমিঞা এ কথার জবাব দিতে পারলে না। কেন এগার সিকের দরে অমন মুসুরিটা বিক্রি ক'রে এল তার কোন কৈফিয়ৎ তার জানা নেই।

—গোঁসা ক'রলি বুঝি! শোভনমিঞার মুখখানা নিজের চোখের দিকে টেনে এনে বসীরণ বলত।

—ধ্যেৎ! তোর ওপর কি গোঁসা ক'রতে পারি?

এবার তাদের মহলা জমে উঠবার কথা। কিন্তু নন্দীপুর ততক্ষণে আকাশের সঙ্গে মিশে যেত ব'লে বাধ্য হ'য়ে দু'জনকে উঠতে হ'ত। লাঠিটা তির্য্যক ভাবে কাঁধের ওপর ফেলে অন্যহাতে বসীরণের হাত ধরে শোভনমিঞা শিষ দিতে দিতে পলাশপুরের পথ বেয়ে চলে যেত। গ্রামের সবাই তাদের যেতে দেখে বলত, এরা কত সুখী। একথা এরাও একদিন বিশ্বাস ক'রত। কিন্তু কেন যে বসীরণের দুর্ম্মতি হ'ল তা কেউ জানে না। একদিন রাত্রির অন্ধকারে গয়না-গাঁটি সব নিয়ে সে পাঁচুমিঞার সঙ্গে পালিয়ে গেল।

আজ শোভনমিঞার সেই দিনটির কথাই বার বার মনে পড়তে লাগল। সেদিন সে-ও কি বসীরণকে কম খুঁজেছিল? এ তল্লাটের এমন গাঁ ছিল না যেখানে সে খুঁজতে কসুর করেনি। কিন্তু এতো হৈ-চৈ ক'রে কি লাভ হ'ল তার? বসীরণকে তো সে পেলে না?

নিবিষ্ট চিত্তে শোভনমিঞা চলেছিল: চলেছিল অতীতের একটি ভারাতুর কাহিনীর ভীড়ের মধ্যে দিয়ে। উৎকট কোলাহলের শব্দে সে থামল। ফগুয়ার তাড়ির দোকানে পুরোদমে হল্লা সুরু হ'য়েছে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মাঝখানে একাকী দাঁড়িয়ে সে নিজের কষিটা একবার পরীক্ষা ক'রে নিলে। আশাতীত দামে বিক্রি হয়নি আজকের খড়গুলো। না হোক। সবদিন বাজার সমান থাকে না। ঘুপসি ঘরটির ক'টি প্রাণীর জীবনের আহ্বান তাকে ভুলিয়ে দিলে বসীরণের চিন্তা: জেরিণার ডাগর চোখ দু'টির ভীরু চাহনির অবেক্ষণ। কতদিন সে তাড়ি খাইনি। বসীরণ খেলে রাগ ক'রত; চাচার বাড়ী চলে যাবে ব'লে ভয় দেখাত। আজ তো আর সঙ্গে সে নেই যে করুণ

নয়নে সেই দিকে তাকিয়েই চলে আসতে হবে। ইতস্ততঃ না ক'রে শোভনমিঞা সোজা দোকানে ঢুকল। ফগুয়া তাকে চেনে। বিশেষ ক'রেই চেনে। তার মত খদ্দের আকাঙ্ক্ষণীয়। নিজে যত পারে গেলে, সঙ্গে করে যাদের আনে তাদেরও গেলায়। তাই হাট-বারে ফগুয়ার মেজাজ ভাল থাকে। কেউ যদি দু'একটা পয়সা কম দেয়, সে নিতে আপত্তি করে না। জানে, শোভনমিঞা আসবে। দেড়া দামে যত খুসী মাল কাটিয়ে দিতে পারবে। হ্যারিকেনটা জ্বেলে খুঁটির সঙ্গে আটকে দেবার পর থেকেই সে সজাগ হ'য়ে থাকত। দৃষ্টি তার বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে চলাফেরা ক'রত। চকিতে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়ে এক দঙ্গল লোক ছেঁড়া চাটাইয়ে এসে বসত। সবাইকে অগ্রাহ্য ক'রে দু'তিনটে কলসী তাদের সামে নামিয়ে রেখে সে নিজের জায়গায় চলে আসত। লতিফ ছিল ইয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রণী। পকেট থেকে নীল রঙের কাঁচের গেলাস বের ক'রে নিজের গামছা দিয়ে ছেঁকে শোভনমিঞার হাতের গোড়ায় এগিয়ে ধরত। এক চুমুকে সমস্তটা গলাঃধকরণ ক'রে সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ত। সে যে কি আরাম, আজ আবার বহুদিন পরে সে নিজের অন্তরে অনুভব ক'রলে।

ভীড়ের মধ্যেও পরিচিত মুখখানাকে চিনতে ফগুয়ার দেরী হ'ল না। মুখে হাসি ফুটিয়ে চোখাচোখি চেয়ে সে বলে উঠল, আলেকাম, বরো মিঞা।

শোভনমিঞা এগিয়ে তার সামে গিয়ে দাঁড়াল।

—দিবো বরো মিঞা, খুব ভাল জিনিষ আছে।

শোভনমিঞা বার কয়েক অসীম শূন্যে মাথাটা দুলিয়ে উৎসুকভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ফগুয়া অন্তর্যামী নয়। তাছাড়া, শোভনমিঞা তাড়ি খাওয়া ছেড়ে

দিয়েছে, একথা তাড়ির দোকানের সবাই জানে। দোকানে ঢোকাটা আজ তার প্রথম নয়। এর আগেও সে কতদিন ঢুকেছে।

ফগুয়া বরং বলেছে, এক গালাস খাইয়া যাও মিঞাছায়েব, নোতুন গাছের রস। ভারি মিঠে।

শোভনমিঞা আপত্তি জানিয়ে বলেছে, বসীরণ বিবির কাছে যে কশম খেয়েছি ছায়েব, তাড়ি আর ছুঁবো না।

একটি কথার আঘাতে ফগুয়ার দুর্ব্বল আশা চূর্ণ হ'য়ে যেত। তারপর পীড়াপীড়ি করবার মত সাহস তার থাকত না। কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে সে বলত, বেচা-কেনা কেমোন হইছে। ন'পুরের জমিটা খাস কবিয়া লইছো না? ক' দেহি বরো মিঞা, এবার পাট খুব চড়া দামে বিকোবে কি না?

শোভনমিঞাও সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে বেরিয়ে চলে যেত।

আজ যে সত্যিই শোভনমিঞা কশম ভুলে গেছে একথা বিশ্বাস করা ফগুয়ার পক্ষে অসম্ভব। সে তাড়ি বেচতে বেচতে বুড় হ'য়ে গেল। ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্রতর অধিবাসীদের নাড়ী-নক্ষত্রের সঙ্গে ঘনিষ্টতা সে অর্জ্জন ক'রে নিয়েছে। নিয়েছে বলেই আজ সাঁইত্রিশ বছর ধরে সে এই দোকান সমভাবেই চালিয়ে এসেছে। কেউ তাকে কাণা ক'রে দিতে পারেনি। এত বড় একটা খদ্দেরকে আবার যদি লোভ দেখিয়ে নেশার মাদকতায় ভিড়িয়ে দিতে পারে, লাভ বৈ লোকসান নেই মনে মনে চিন্তা ক'রে সে পুনরায় জিজ্ঞেস ক'রলে, কি ছায়েব লইয়া আসব?

এবার মাথা দোলানর অর্থ ফগুয়ার নিকট স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। তাড়াতাড়ি নিজের আসন ছেড়ে উঠে সে একটা ঝাঁপি তার হাতের গোড়ায় এনে বসিয়ে দিলে।

—কিছু চাট দিবো বরো মিঞা ? বেশ মোলায়েম ভাবে ফগুয়া প্রশ্ন ক'রলে।

অন্যমনস্কভাবে শোভনমিঞা জবাব দিলে, একটু জলদি ক'রে লিয়ে এস। আমাকে আবার তো ফিরতি হবে।

শালপাতার ঠোঙায় কতকগুলো লঙ্কা মাখান ছোলা ভাজা ও দু'টো পিঁয়াজি এনে ফগুয়া তার হাতে দিলে।

—গালাস মেলেনি বুঝি! দারাও, দারাও—ফগুয়া ব্যস্ত হ'য়ে গেলাস আনতে চলল।

শোভনমিঞা ঘরের মধ্যে নিরিবিলি একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে উঁচু হ'য়ে বসল। ঝামেলা আজকাল তার ভাল লাগে না। বসীরণ চলে যাবার পর থেকে অনেক কিছুরই পরিবর্ত্তন হ'য়েছে তার জীবনে। সে-পরিবর্ত্তনের জন্যে সে নিজের ভাগ্যকে দোষ দেয়। বসীরণকে দোষী করে না। বসীরণ তার কপাল ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। এর জন্যে এখনো সে কৃতজ্ঞ। শোভনমিঞা বেইমান নয়।

অনেক দিনের অনাস্বাদিত তৃপ্ততা আজ আবার শোভনমিঞাকে আনন্দিত ক'রলে। ভরপুর নেশায় মশগুল হ'য়ে সে ফগুয়ার সাম্নে এসে কাঠের বাক্সটার ওপর ঝাণাৎ ক'রে একটা টাকা ছুঁড়ে দিলে।

ফগুয়া বাকী পয়সা তার হাতে গুণে দিয়ে বললে, জিনিষটা কেমোন ছায়েব ?

শোভনমিঞা জবাব না দিয়েই বেরিয়ে গেল।

তখন আকাশে চাঁদ ওঠেনি। ঘন পাতা ভেদ ক'রে জ্যোৎস্নার টুকরো আলোর পথে আসবার সামর্থ্য ছিল না। তবু শোভনমিঞা ঠিক চলল। যে-পথ ধরে সে সাতাশ বছর একাধিক্রমে চলে এসেছে, সে-পথের ভুল হ'বার জো নেই।

জেরিণার অনুমান মিথ্যে নয়। শোভনমিঞা তাড়ি গিলে আসবে।

এসেওছে শোভনমিঞা তাড়ি গিলে। জেরিণা অবশ্য এ জন্যে অভিযোগ ক'রলে না; ক'রলে রাত ক'রে ফেরার জন্যে। তার অনুযোগ নিরর্থক নয়। ঠেঙাড়ের মাঠে আবার মার-ধোর সুরু হ'য়েছে। পরশুদিন হীরু গয়লার সব কেড়ে নিয়েছে। গ্রামের সবাইকে সে বলতে শুনেছে, প্রাণে মারেনি, এই-ই যথেষ্ট। তাই সে নিজের অনুমানে এতক্ষণ সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি। স্বামীকে অক্ষত শরীরে ফিরে আসতে দেখে সে বললে, কখন হোতে দাড়িয়ে রয়েছি তুই আসবি বোলে। তোর পাত্তাই নেই। করিমচাচা ফিরে এল, রহমান ফিরে এল, মুন্সীগঞ্জের রামকানাই ফিরে এল; তবুও তুই এলি না।

—তোর বুঝি ডর লেগেছিল।

—হুঁ। তুই ক্যেন এত দেরী ক'রে ফিরলি?

শোভনমিঞা বসীরণের কব্জি যেমন চেপে ধরত, তেম্নি চেপে ধরে বললে, ক্যেন জানিস জেরিণা? বসীরণ বিবিকে দেখে এলুম।

—দূর! পাঁচুমিঞা তো তাকে কোলকাতা নিয়ে গেছে। নেশা ক'রে তোর মাথার কিছু ঠিক নেই। চল, দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে দি গে—

শোভনমিঞাকে টানতে টানতে জেরিণা দাওয়ার মধ্যে নিয়ে এল। কুলুঙ্গিতে ডিবেটা বসিয়ে সে ভেতর থেকে মাদুর এনে ছড়িয়ে দিলে। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে শোভনমিঞা বসেছিল হাঁটু দু'টো এক ক'রে গুটিয়ে। জেরিণা তার পাশে উবু হ'য়ে বসে জিজ্ঞেস ক'রলে, হ্যাঁরে, তুই সত্যি বসীরণকে দেখে এলি?

—তুই তো আমার কথা বিশ্বেস ক'রবি না! তুঁত গাছটার কিনারেই সে দাড়িয়েছিল।

—তোকে কি বোললে রে? বল না, শুনি?

—আরে ধূর! মুখ বিকৃত ক'রে শোভনমিঞা বললে, আমার সাথে কথা কইবার লেগে যেন সে দাড়িয়েছিল।

—তুই বুঝি তার সাথে কথা বোলিসনি?

—সত্যি বলি নি। বলনা, ক্যান বোলবো? সে কি আর আমার বৌ লাগে?

—তবে তুই দাড়িয়েছিলি ক্যান? ফের বুঝি ওকে নিকে ক'রবি?

—দূর! তোর যেমন কথা! ওকে নিকে ক'রতে যাব ক্যেন? ও আমার কলজে ভেঙে দিয়ে গেছে।

বসীরণের সাক্ষাৎ পেয়েও শোভনমিঞা কথা কয়নি শুনে জেরিণার আনন্দিত হবার কথা কিন্তু সে মোটেই খুসী হ'তে পারলে না। মাগীটা দেশছাডা হ'য়েছিল ব'লে সে পীরের নামে সিন্নি দিয়েছিল। আবার এসে জুটেছে শুনে সে অতিমাত্রায় বিচলিত হ'ল। এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করবার তার প্রবৃত্তি হ'ল না; চোখ দু'টির কৌতূহল-ও তেমন আর দেখা গেল না। শোভনমিঞাকে জোর ক'রে শুইয়ে দিয়ে সে রান্নাঘরে সেঁধুল।

জেরিণা আজ আর কিছু খেলে না। তার মন ভাল নেই। বসীরণের কথা শুনে পর্য্যন্ত সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছে না। মমতাজের মুখে সে শুনেছে, বসীরণ বশ করতে জানে। জানুক গে। শোভনমিঞাকে সে আর রাজীবপুরের হাটে যেতে দেবে না। গোলাপডাঙার হাটে তেমন খদ্দের আসে না। তাই এ অঞ্চলের কেউ ও-হাটে যায় না। শোভনমিঞাও যদি এই কারণে যেতে না চায়। তাহ'লে সে কি ক'রবে? কি ব'লে সে তাকে রাজী করাবে? সব সে গুলিয়ে ফেললে। ঘরের ঝাঁপ ঠেসিয়ে দিয়ে সে দাওয়ায় এসে বসল। উঠানের তেঁতুল গাছটার জন্যে দাওয়ায় মোটেই আলো আসে না। অন্যদিন আলো না আসার দরুণ সে মনে মনে কত বিরক্ত হ'য়েছে।

আজ কিন্তু তার অন্ধকারই ভাল লাগল। অন্ধকারের একপ্রান্তে লুকিয়ে সে চুপচাপ বসে রইল। সাময়িক উত্তেজনার ঢেউ বারবার আঘাত দিয়ে তার নিরীহ মনকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললে। শোভনমিঞার ও-পথ বন্ধ করবার উপায় খুঁজতে খুঁজতে রাত গভীর হ'য়ে এল; তবু সে নিজের মনে সান্ত্বনা খুঁজে পেলে না। এম্নিভাবে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেই কি আজ রাতটা তার কাটবে? সে আর এ নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে পারে না। পাড়া নিশুতি হ'য়ে গেছে। শোভনমিঞা অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। চাঁদ তেঁতুল গাছের মাথা ডিঙিয়ে পাশে হেলে এসেছে। নরম আলো এসে তার মুখে, তার চুলে, তার শাড়ীতে এসে লেগেছে। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে সে নিদ্রিত স্বামীর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বারকয়েক ডাকলে, এই, ওঠ না—

কিন্তু শোভনমিঞার নিদ্রাভঙ্গের কোন সম্ভাবনা নেই দেখে জেরিণা একাই ঘরের মধ্যে ঢুকল। সমস্ত চিন্তাকে সরিয়ে দিয়ে সে এইবার ঘুমবার চেষ্টা ক'রবে। ভোরে উঠেই আবার তাকে মরাইয়ে ধান বোঝাই ক'রতে হবে। তক্তাপোষের ওপর বিছানা পাতাই ছিল। ঘরের হুড়কো লাগিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়লেও ঘুম তার তখুনি এল না। যতক্ষণ জেগেছিল, ততক্ষণ কেবলই ভেবেছে ধান তুলতে তুলতে কখনই বা সে মমতাজের কথাটার সত্যতা প্রমাণ ক'রতে মুন্সীগঞ্জে যাবে আর কখনই বা করিমচাচাকে ব'লে বসীরণকে তাড়াবার ব্যবস্থা ক'রে আসবে।

ভোর হ'ল। কাক-কোকিল ডাকতে সুরু ক'রে দিলে। গফুর-মিঞার বলদ জোতা পর্য্যন্ত হ'য়ে গেল। নন্দ বোষ্টম একতারার সুরে বাউল গাইতে গা[illegible]কাছারি বাড়ীর পাশ দিয়ে বেঁকে চলল। তিনকড়ির দোকানে ধুনো-গঙ্গাজল দেওয়া শেষ হ'ল। চৌকিদার

ঘুমন্ত চোখ দু'টো রগড়ে অশথ তলা থেকে উঠে হাতের লাঠির শব্দ ক'রতে ক'রতে সাঁকো ডিঙ্গিয়ে চলে গেল। নন্দ জেলে জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অমন যে করিমচাচা—বয়েসের গাছ-পাথর নেই যার—সে-ও জন-মজুর সঙ্গে নিয়ে ধান কাটতে চলল। যে-শোভনমিঞা নেশার ঝোঁকে সারারাত অচৈতন্য হ'য়ে পড়েছিল, সে পর্য্যন্ত জেগে উঠল। তবু জেরিণার ঘুম ভাঙ্গল না।

রোদ ফুটে বেরুল। গ্রামখানি কলরবে ভরে উঠল। শোভনমিঞার গোরু দু'টোকে গোয়াল থেকে খুলে তেঁতুলতলায় বাঁধা হল, জাব দেওয়া হ'য়ে গেল। তখনো জেরিণা ঘরের দরজা খুললে না।

শোভনমিঞা অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠল। দাওয়ায় বসে বসে কি ভেবে নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। আবার ফিরে এল। আবার দাওয়ায় এসে বসল। সন্ধ্যের অস্পষ্টতায় সে বসীরণকে ঠিকমত চিনতে পারেনি। না-পারার ক্ষোভ তাকে নিয়তই জ্বালিয়ে মারছিল। তাই সে ঠিক ক'রেছে, খররৌদ্রের প্রখরতায় সে বসীরণকে দেখতে যাবে। দেখে তার কোন লাভ নেই। তবু তার ঝোঁক চেপেছে দেখে আসবে। দেখে আসবে যে বসীরণ অনেকক্ষণ তাকে না দেখে সকল বিপদকে তুচ্ছ ক'রে ঠেঙাড়ের মাঠে একলা গেছে, এতদিন তাকে না দেখে সে কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে।

শোভনমিঞা আর ধৈর্য্যের বল্গা টেনে রাখতে পারলে না। দরজায় করাঘাত ক'রে জেরিণার নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

হুড়কো খোলার শব্দ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে কবাট খুলে গেল। শাড়ির একাংশ দিয়ে অনাবৃত বুকখানা ঢেকে জেরিণা শোভনমিঞার সাম্নাসাম্নি এসে দাঁড়াল।

—ফরসা হ'য়ে গেছে কখন; আমাকে ডাকিসনি ক্যেন? জেরিণা শোভনমিঞাকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললে।

—ডাকিনি পাছে তুই গোঁসা করিস।

—তবে একন ডাকলি ক্যেন? একন বুঝি গোঁসা ক'রব না?

—না রে না; শোভনমিঞা হো হো ক'রে হেসে উঠল, রাজীবপুরে যাব কি না; তাই তো তোকে ডাকলুম।

—রাজীবপুরে ক্যোনে যাবি শুনি?

—সেই যে তুই বলিছিলি, লাল চুড়ি—

—চুড়ি আমি পরব না। তোকে যেতে হবে না।

—তোর আজ কি হয়েছে বলতো জেরিণা? সকাল হ'তে তোর মেজাজ এমোনতরো বিগড়ে গেল ক্যেন রে?

—যা বেশী বকিসনি! আপন কাজে চলে যা। রাজীবপুরে তুই যেতে পাবি না। যদি শুনি গেছিস বিষ খেয়ে মরব।

—আজকের দিনটা যেতে দে জেরিণা। আর কোনদিন যাব না।

—চুড়ি আনবি তো?

·হু।

—খুব হুঁসিয়ারে যাবি। বসীরণ যেন তোকে দেকতে না পায়। সে মনতর জানে। একা পেলে সে তোকে বশ করে লিবে।

শোভনমিঞার সব শোনবার মত সবুর সইল না। তখুনি অদৃশ্য হ'য়ে গেল। নন্দীপুরের তেমাথায় গফুরমিঞার সঙ্গে তার দেখা হ'ল।

গফুরমিঞা জিজ্ঞেস ক'রলে, এমন হনপন ক'রে কোতা চোললে ছায়েব?

—রাজীবপুরে চোলছি। তুই একন কোতা চোললি?

—সইলেনবাবুর বউডা আইসছে না—

শোভনমিঞার মনে হ'ল যেন গাড়ীখানি অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলেছে। গফুরমিঞা চুল পাকিয়ে ফেললে গাড়ি চালিয়ে। গাড়ী আস্তেই চলুক আর না-ই চলুক, কই, কেউ বলুক দিকি; কোনদিন তার

ষ্টেশনে পৌঁছতে দেরী হ'য়েছে। তাই তাকে সাবধান ক'রে দেবার জন্যে শোভনমিঞা বললে, এম্নিভাবে গেলে পউছুবি কখন শুনি? যা, জোরে হাকিয়ে যা—

গফুরমিঞা বলদ দু'টোর ল্যাজ মুড়ে দিয়ে দৌড় করাবার চেষ্টা ক'রলে। হালকা গাড়ি। তাড়া পেয়ে বলদ দু'টো ছুটবার উপক্রম ক'রলে। গাড়ি চলল সাঁই সাঁই ক'রে।

শোভনমিঞাও গতির বেগ বাড়িয়ে দিলে। এত বেলা পর্য্যন্ত যদি বসীরণ কৌতূহলী হ'য়ে না দাঁড়িয়ে থাকে, যদি জনতার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হ'য়ে যায়।

শোভনমিঞার ধারণা ভ্রান্ত।

চড়কডাঙার মাঠে ভোর থেকেই লোকে লোকারণ্য। শব্দায়মান স্থানটির বিকীর্ণ কলরব অনেকদূর থেকে শোভনমিঞা শুনতে পেলে। না হয় মেয়েটি পালিয়েই গেছে, এ আর এমন কি দোষণীয়? সে যদি সুখী হ'তে পারে, হোক না। এদের তা'তে বাধা দেবার কি অধিকার আছে? এম্নি ক'রে তার সুখী হবার বলবতী আগ্রহকে থেঁৎলে দিয়ে এদের লাভই বা কি? সে তো জন্মের মত চলে গেছে: সে তো আর আসবে ব'লে যায়নি। তবে কেন এরা নিজেদের মনে এত অশান্তি সৃষ্টি ক'রে চলেছে। এদের এই মিলিত মনস্কামের মধ্যে কোথাও ভগবানের কোন সাঙ্কেতিক নির্দ্দেশ আছে কি না তা এরাই জানে। সে সংবাদ রাখবার প্রয়োজন শোভনমিঞার কোনদিন হয়নি। সে জানে, ভালবাসা মিথ্যে। ভগবান নেই।

পূর্ব্বেকার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে এসে শোভনমিঞা দাঁড়াল। প্রকাণ্ড তুঁত গাছটিকে কেন্দ্র ক'রে তার দীর্ঘ দৃষ্টি সচল হ'য়ে উঠল। অনেকক্ষণ সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। বসীরণের অবাঞ্ছিত অনুপস্থিতি তাকে

ভুলিয়ে দিলে অতীতের জরাজীর্ণ একটি দিনের শপথ। তুঁত গাছটির দিকে সে এগিয়ে চলল।

নরহরি চাটুর্য্যেকে বলতে শোনা গেল, সতীর যে এমন শোচনীয় অপমৃত্যু ঘটবে, এ কথা কে-ই বা জানত?

সনাতন ঘোষাল বললেন, আশ্চর্য্য চাটুর্য্যেমশাই, ডুবল কেমন ক'রে? রায়েদের পুকুরে অমন শান-বাঁধান ঘাট! কোথাও এতটুকু শ্যাওলা ব'লে কিছু নেই!

শোভনমিশ্রা অন্যত্র চলে গেল।

রাধিকাবাবুর স্ত্রীকে বলতে শুনলে, সতীর সেই ভাইটা তো পাগলের মত হ'য়ে গেছে। হবারই কথা। সে সতীকে কি ভালই না বাসত! একটুখানি ফাঁক পেয়েছে কি অমনি ছুটে এসেছে বোনটিকে দেখতে। বোনের মত বোনও ছিল আমাদের সতী। ভালবাসতে ইচ্ছে যায়। রাধিকাবাবুর স্ত্রীর স্বর কেঁপে উঠল। চোখ ভিজে এল।

পাশের সঙ্গিনীটি জানালে, সবাইয়ের আক্কেলখানা তো দেখলি? অমন সাধ্বী-সতীর নামে কত বড় একটা দুর্নাম ওরা অক্লেশে চাপিয়ে দিচ্ছিল। ভাগ্যিস, সতীর মৃতদেহ ভেসে উঠল, তাই রক্ষে। নইলে পশুপতিদাকে কলঙ্কের বোঝা নিয়ে ভিটে ছেড়ে পালাতে হ'ত।

শোভনমিশ্রা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না।

সরকার গিন্নীর গলা শোনা গেল, শুনেছ দিদি, মুখুজ্জ্যেদের বিশু কি বলেছে? পরশুদিন সন্ধ্যের সময় টুনটুনির বাসা চুরি ক'রতে সে রায়েদের বাগানে গিসল। সেই সময়ে কা'কে যেন চেঁচিয়ে বলতে শুনেছে, বাঁচাও, ডুবে যাচ্ছি। দুষ্টু ছেলে ভয়ে কারুকে কিছু আগে বলেনি।

আন্নার মা বললেন, উঁহু আমার মনে হয় রায়েদের ঘাটের পাড়ে চাঁপা গাছটায় নিশ্চয়ই কিছু আছে। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কাপড় কাচতে গিয়ে ঐ গাছটার মগডালে স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

শোভনমিঞার সতীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ চঞ্চল হ'য়ে উঠল। সে সে-স্থান পরিত্যাগ ক'রলে।

মদন তখন বলছে, লোকের আর কি? রটিয়ে দিলে পালিয়ে গেছে। ভাল ক'রতে তো কেউ পারবে না, মন্দ ক'রতেই আছে। সতী মরে এ যাত্রা তার স্বামীকে বাঁচিয়েছে ব'লতে হবে। তা না হ'লে সমাজে কি ওর স্থান হ'ত ভেবেছিস? কাল রাত্তিরে চাটুর্য্যেমশাইয়ের বৈঠকখানায় ছিলি তো? কি অপমানই না সবাই তাকে ক'রলে? তার অপরাধ: সে গরীব। চাটুর্য্যেমশাইয়ের বিধবা মেয়ে শিবরাণী যেদিন গৌতমের সঙ্গে পালিয়ে গেল, কৈ সেদিন তো কেউ টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত ক'রতে পারেনি। পারবে কেন? চাটুর্য্যেমশাই এ গ্রামের জমিদার।

শোভনমিঞা আবার তুঁত গাছটার নিচে এসে দাঁড়াল।

সেই সময় সতীকে শোভাযাত্রা ক'রে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হ'ল। জনসমুদ্র সেইদিকে ঢলে পড়ল। জনশূন্য প্রান্তরে প্রাণহীন পাথরের মূর্ত্তির মত শোভনমিঞা শুধু একাকী দাঁড়িয়ে রইল।

দেবতারা শুধুই মাটির

স্বামী-স্ত্রী লইয়াই সংসার। কিন্তু সুখের নয়।

বিয়ে হইবার পর হইতেই কবিতার একটা না একটা রোগ লাগিয়াই আছে। ক্রমাগত ভুগিয়া ভুগিয়া তার দেহের সমস্ত রক্ত নিঃশেষিত হইবার উপক্রম। সাদা হইয়া গিয়াছে তার চেহারা। ভিতরকার নীল শিরগুলো পর্য্যন্ত প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। বিছানায় শুইয়া শুইয়া রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তার মেজাজ: উত্যক্ত হইয়া গিয়াছে তার মন। বাঁচিবার সাধ তার আর নাই। সুন্দব পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার স্বপ্ন তার চোখ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। মরিতে পারিলে সে এখন বাঁচে। রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিবার মত সহিষ্ণুতা তাব আর নাই। খুব হইয়াছে—এইবার স্বামীকে নিষ্কৃতি দিতে না পারিলে তার নিজেরও অব্যাহতি নাই। স্বামীকে সুখী করিবার পরিবর্ত্তে প্রতিদিন সে স্বামীর সুখ কাড়িয়া লইয়াছে। মৃত্যু কামনা তার প্রবল: অনাসক্তি তার সবতাতেই।

অনুপমের কিন্তু এতটুকু বিরক্ত নাই। কবিতাকে বাঁচাইয়া তুলিবার প্রয়োজনে বিধি-নিষেধের পথনির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিতে তার বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই। তার দীর্ঘ জীবনের বিনিময়ে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিতে সে মোটেই অনিচ্ছুক নয়। সে একথা কেমন করিয়া বুঝাইবে যে তাকে কেন্দ্র করিয়াই তার জীবন: তার জীবনের পরিপূর্ণতা।

কবিতা অবুঝ। তাই ঔষধ খাইতে ঔদাসীন্য দেখায়ঃ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই আপত্তি জানাইয়া বসে। ইহাতে অনুপমের দুঃখ নাই। খিটখিটে স্বভাব তার চিরদিনের নয়। রোগে পড়িলেও অমন হইয়াই থাকে।

নিরবিচ্ছিন্ন নিরাশার এই একঘেয়ে মহোৎসবের মাঝখানে আশার ক্ষীণ আলো দেখা দিল। কবিতার ঘরের জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইল। আজ আর তার জ্বর আসে নাই।

অনুপম সারাদিন সুউজ্জ্বল আগামীকালের স্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিল। কবিতা প্রশান্ত স্থৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া প্রদীপ্ত আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দিন কাটাইয়া দিল। কথা আজ সে বেশী কয় নাই। কেবলই ভাবিয়াছে। একমনে ভাবিয়াছেঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দের ন্যায় যে-জীবনে কোনদিন সে মিল খুঁজিয়া পাইল না সাম্যময় অনুষ্ঠান সে-জীবনে পুনরায় সম্ভব হইবে কি না!

সন্ধ্যায় ডাক্তার পাল আসিলেন। আজ আর তিনি বুক পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইলেন না। দুপুরে ঘাম হইয়াছিল কিনা, সেকথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কবিতার রুগ্ন বিছানায় বসিয়া শুধু তাকে সান্ত্বনা দিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। জয়ের গৌরবে তাঁর মুখে আজ প্রফুল্লতার উজ্জ্বল দীপ্তি। অনেকক্ষণ তিনি বসিয়া রহিলেন অকারণে। কথাও তিনি যে সব সময় কহিয়াছেন, তাহাও নয়। কেবল মাঝে মাঝে টুকরো এক আধটা কথা উচ্চারণ করিয়া তিনি নিজের উপস্থিতিকে সজাগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সিগারেটের ধেঁাওয়া ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট এক একটি কথা—এই যেমন, সপ্তাহে সপ্তাহে ওজন নিতে হবে; ক্যালসিয়াম ইন্‌জেকশ্যান এখনও নিয়মিত চলবে; কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে শিগগির বেরিয়ে পড়া উচিত।

বিদেশে যাইবার কথা শুনিয়া অনুপম চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িল। একে তো নিজের এই ঘরখানি ছাড়া অন্য কোথাও যাইয়া রাত্রে সে ঘুমাইতে পারে না। তাহার উপর সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে কেমন করিয়া প্রত্যহের যাবতীয় অসমঞ্জস মানাইয়া চলিবে, সেই ভয় তাকে বিবর্ণ করিয়া দিল। কিন্তু সে ক্ষণিকের। কবিতা তার নিজের জীবনের চেয়েও বেশী প্রিয়। ডাক্তারের সাবধানতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সে ইতস্ততঃ করিল না।

কয়েকদিনের মধ্যেই কবিতাকে লইয়া অনুপম হাজারিবাগে চলিয়া আসিল। প্রতি সপ্তাহে তার ওজন লইতে ভুল হইল না। একটি দিনও ক্যালসিয়াম ইন্‌জেকশ্যান বাদ পড়িল না।

বেশ জায়গাটি। আসিবার পূর্ব্বে কবিতার যত খারাপ লাগিয়াছিল, যাইবার পূর্ব্বাহ্নে ততই ভাল লাগিতেছে। এ সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে তার মন চায় না। বিশেষতঃ বাড়ীখানি।

বাড়ীখানি অনুপম ইচ্ছা করিয়া সহরতলীর একেবারে প্রান্ত সীমায় লইয়াছিল। ডাক্তার পাল কবিতাকে অল্প অল্প বেড়াইতে বলিয়াছেন। প্রথম সূর্য্যকিরণে স্নান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। সহরের আবহাওয়ার মধ্যে এ সবের সুবিধা নাই। তাছাড়া নিরিবিলিতে থাকা তার চিরদিনের অভ্যাস। কবিতারও এখন রীতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাই হার্ণগঞ্জের কৃশ্চান কলোনি পার হইয়া যে নিঃসঙ্গ বাড়ীখানি অসমতল মাঠের মধ্যে একাকী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সেই শব্দহীন স্থানটিতে ক্ষণিকের বাসা বাঁধিতে কাহারও আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। কিন্তু এত বড় নির্জ্জনতা তারা ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই। কাজেই সাঁওতালি চাকর শনিচারীকে রাত্রে বাড়ী যাইতে দেওয়া হয় না। ইহাতে সাহসও বাড়ে: ভরসাও পাওয়া যায়।

ভরসা অবশ্য থাকিতে থাকিতে নিজেদের উপরও যথেষ্ট জন্মিয়াছে।

তবু কবিতা একা বাড়ীর বাহিরে যাইতে পারে না। অনুপম সঙ্গে না থাকিলে তাহার বেড়ান মনঃপুত হয় না। ইহার জন্য কত পরিচর্য্যাই না তাকে করিতে হয়। কিন্তু এত করিয়াও সে স্বামীকে একদিনও বেড়াইতে যাইবার কথা বলিতে শুনিল না।

পথ চলিয়া সময় নষ্ট করা অনুপমের স্বভাব-বিরুদ্ধ। ছাত্রজীবনের অভ্যাস তার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। কাজ করিবার কিছু না থাকিলে সে মোটা মোটা কেতাবের কালো অক্ষরগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইয়া বসে।

আজও দুপুরে অনুপম বই লইয়া বসিয়াছিল। একবারও উঠে নাই।

বৈকাল হইতে ঘনঘটা সুরু হইয়াছে। ঘরে আলোর শীর্ণ রেখাপাত সেই স্বপ্লান্ধকারের বুক চিরিয়া নিজেকে সুপ্রকাশ করিতে অসমর্থ। অনুপম বৃষ্টির সম্ভাবনায় বেড়াইতে যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল। শার্সির কবাট খোলা—শীতল বাতাস ঘরে ঢুকিয়া বুকের কাছে আসিয়া নিজেদের অস্তিত্ব জানাইবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। চাদরখানা বেশ করিয়া মুড়িসুড়ি দিয়া সে ডিটেকটিভ উপন্যাসে নিজেকে মগ্ন করিয়া দিল। কবিতা বেড়াইতে যাইবাব পোষাকে নিজেকে পরিবৃত করিয়া ঘরে ঢুকিল।

অনুপম তন্ময় হইয়া গিয়াছে। হয়তো গল্প জমিয়া উঠিয়াছে। তার উঠিবার বিশেষ কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

কবিতার আজ সকালে বেরুন হয় নাই। পলমলের বোসগিন্নী মেয়েদের লইয়া বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। সকলের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে বেড়াইতে যাইবার অবসর তার উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এবেলা যদি তার যাওয়া না হয়, রাত্রে হয়তো সে ঘুমাইতে পারিবে না।

ঘুম যে হইবে না তাহা অনুপমও জানে। কিন্তু আকাশের এই

ভীষণ চেহারা দেখিয়াও যে কবিতা যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে তাহা সে জানিতে পারে নাই।

কবিতার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। অনুযোগের সুরে বলিল, উঠবে না এইখানেই বসে থাকবে? বেড়াতেও কি তোমার ভাল লাগে না? দিনরাত বই মুখে পড়ে থাকতেও পারো বাপু!

—বেড়াতেই না হয় এসেছ। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে বেড়াবার কথা তো ডাক্তার পাল ব'লে দেননি?

—বৃষ্টির ভয়ে যদি না-ই বেরুবে তবে রেনকোটগুলো সঙ্গে এনেছিলে কি ক'রতে? বৃষ্টি আসবে ব'লে যেন সবাই তোমার মতন সাত সকালে আলো জেলে বই নিয়ে বসেছে। আচ্ছা কুঁড়ে যা হোক, একটা কিছু ছুতো পেলে আর রক্ষে নেই। ওঠো, ওঠো,—রাস্তায় বেরিয়ে দেখবেখন সবাই বেড়াচ্ছে।

বাধ্য হইয়া অনুপমকে উঠিতে হইল।

রাঁচি রোড ধরিয়া তারা সমান চলিল। ডানপাশের ক্ষীরগাঁয়ের সোজা পথ পিছনে পড়িয়া রহিল। গীর্জ্জার তীব্র আলো স্তিমিত অন্ধকারের গহ্বরে মিশিয়া গেল। যতই তারা অগ্রসর হইতে লাগিল, স্বাস্থ্য অন্বেষণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গতিতে তাদের অফুরন্ত উৎসাহ: প্রাণে তাদের প্রখর উল্লাস। কলকোলাহলের বিচিত্র ভঙ্গিমায় জীবনের সমারোহ যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

চলিতে চলিতে কবিতা বলিল, এদের দেখেও তোমার ঘরের কোণে বসে থাকতে ভাল লাগে?

অনুপম কথার জবাব দিল না। এ প্রশ্ন কবিতার আজ নূতন নয়।

—ভেবেছিলুম তোমার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হবে।

—এই হাজারিবাগে এসে—

—হুঁ। কবিতা স্মিত হাসিল।

—ভুল ভেবেছিলে। বরং এখানে এসে আমার পড়বার নেশা আরো বেড়ে গেছে।

—তুমি আমাকে খালি রাগাতে চাও।

অনুপম কবিতাকে পাশে টানিয়া লইল। এ অভিনয় তাকে রোজই দেখিতে হয়। মৃদুস্বরে বলিল, তুমি তো না রাগলেই পার কবি?

কবিতা নিশ্চুপ হইয়া গেল। তার মান-অভিমান এমন-ই।

এই রাস্তায় তারা বহুদিন আসিয়াছে। ইহার মধ্যে এমন কোন নূতনত্বের আভাস লুকান নাই; যাহা উভয়ের কাছে পরম লোভনীয়। চোখ বুজাইয়া তারা বলিয়া দিতে পারে, এই রাস্তার কোথায় কি আছে। পরিচিত পথ ধরিয়াই তারা চলিল।

কুণার ব্রীজের মাথায় আসিয়া অনুপম বলিল, এইবার ফেরা যাক। আর বেশী বাহাদুরী দেখিয়ে লাভ নেই।

কবিতা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

—থমকে দাঁড়িয়ে রইলে যে—অনুপম বলিল, ফেরো।

কবিতার ফিরিতে আপত্তি ছিল না। আকাশের ব্যাপার দেখিয়া তার সত্যই ভয় হইয়াছে।

ভয় অনুপমেরও হইয়াছে। তবে আকাশ দেখিয়া নয়। বাড়ীর অবস্থা চিন্তা করিয়া। সে হয়তো ঢুকিয়া দেখিবে, ঠাকুরের উনান জ্বালান হয় নাই। শনিচারী পানের দোকানে তামাক খাইতে চলিয়া গিয়াছে।

শনিচারী আজ মৌতাতের লোভ সংবরণ করিয়াছে। ঘরের আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছে। শার্সিগুলো বন্ধ করিবার কথাও আজ তাকে বলিয়া দিতে হয় নাই।

অনুপম বলিল, তুমি ততক্ষণ চা চাপাও গে, আমি মুখুজ্যে সাহেবের বাড়ী থেকে একখানা বই নিয়ে আসি।

—একটুও দেরী ক'রো না।

—চায়ের আগেই এসে পড়ব।

অনুপম মুখুজ্জ্যে সাহেবের বাড়ী অভিমুখে চলিল। কবিতা গেটের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

ঘরে ঢুকিয়া প্রদোষকে দেখিয়া কবিতা অবাক হইয়া গেল।

—অনুপমের খোঁজে এসেছি—প্রদোষ সবিনয়ে বলিল।

উত্তর না দিয়া কবিতা ভিতরে চলিয়া গেল। এই মুখখানি তার বহু পরিচিত। একদিন এই মুখখানিকে ঘিরিয়া সে আশা-আকাঙ্ক্ষার সুউচ্চ প্রাসাদ গড়িয়াছিল। অতীত তার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

চায়ের পূর্ব্বেই অনুপম আসিয়া পড়িল। বাল্যবন্ধু প্রদোষকে দেখিয়া তার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

—তুই? হঠাৎ কিছু না ব'লে কয়ে—আনন্দে অনুপম বাকী কথাগুলো শেষ করিতে পারিল না।

—বিভুতি যেতে পারলে না ব'লে আমাকেই আসতে হ'ল। এসে শুনলুম, তোরা এখানে এসেছিস।

অনুপম স্ত্রীকে হাঁক দিয়া ডাকিল।

প্রদোষ বলিল, ওকে দেখবার সৌভাগ্য আমার আগেই হ'য়েছে। ডেকে আর দেখাতে হবে না।

কথাটি অনুপমের নিকট অস্বাভাবিক ঠেকিল। প্রশ্ন করিল, এক মিনিটও বোধ হয় দেখবার সুযোগ মেলেনি?

—না রে না, আমার প্রথম বিয়ের কথা হয় তোর ওই মানসীর সঙ্গে।

—বলিস কি? তারপর হ'ল না কেন?

—সে অনেক কথা। এখন এই ঠাণ্ডায় এক পেয়ালা চা সে-কথা শোনার চেয়ে বেশী লোভনীয়।

ষ্টোভের শব্দ শুনা যাইতেছিল। অনুপম ইঙ্গিতে সেই শব্দের দিকে বন্ধুর মনোযোগ আকর্ষণ করাইল।

প্রদোষ সিগারেট ধরাইল, ধরাইয়া বলিল, এখানে দু'জনে খুব বেড়াচ্ছিস, না ?

—হুঁ। অনুপম উৎকীর্ণ দৃষ্টি তার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া বলিল, কিন্তু তোর এ অভ্যেস আবার কবে থেকে হ'ল ?

—ঠিক মনে পড়ে না। এক মুখ ধোঁওয়া ছাড়িয়া প্রদোষ বলিল।

—শুনেছিলুম মাঝে তুই নাকি বিলেত গিসলি ?

—ভুল শুনিসনি। জোর করিয়া সিগারেটে টান দিয়া প্রদোষ বলিল, বিলেত যাওয়াটা তো আজকাল ফ্যাশান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বেড়াতে গেসলুম—বেড়িয়েই ফিরে এলুম। যেমন তোরা এসেছিস এখানে।

চা আসিল।

কবিতা অহেতুক লজ্জায় কোনমতেই ঘরের মধ্যে আসিতে পারিল না। মনকে সারাক্ষণ স্তোকবাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা তার নিষ্ফল হইল। অতীতের বিস্মৃত প্রায় একটি দিবসের উত্তরণ তাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া দিল। অন্ধকার ঘরে জানালা খুলিয়া দিয়া সে চুপচাপ বসিয়া রহিল। স্বামীর আহ্বান তার কানে আসিয়াছিল; তবু সে নড়িল না। এমনধারা ক্লান্তির গভীর ইঙ্গিত সে এখানে আসিয়া একদিনও অনুভব করে নাই। অনুপম বার কয়েক ডাকিয়াও যখন তার সাড়া পাইল না, নিজেই উঠিয়া যাইতেছিল।

প্রদোষ তাকে বাধা দিয়া বলিল, আজ থাক বরং কাল এসে ওর সঙ্গে আবার নতুন ক'রে আলাপ করা যাবে। বাড়ীতে কেউ নেই। সাথী তো আসতেই দিচ্ছিল না ? কথাগুলো শেষ করিয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল।

বন্ধুর সহিত কথা কহিতে কহিতে অনুপম রাস্তায় নামিল।

নির্জ্জনে বসিয়া বাতাসের হীম-শীতল স্পর্শ উপভোগ করিতে কবিতার আজ বিরক্ত ধরিল। সোয়েটারের সরঞ্জাম লইয়া সে এঘরে আসিল। গভীরভাবে নিজেকে নিযুক্ত করিতে না পারিলে সময় কাটান তার পক্ষে দুরূহ। নিবিষ্ট চিত্তে সে সোয়েটার লইয়া বসিল। কিন্তু কেবলই ঘর পড়িয়া যাইতে লাগিল। অত্যন্ত অলস ঠেকিতেছে তার আজকের সন্ধ্যাটি। বুনিতে তার ভাল লাগিল না। সমস্ত চিন্তা একত্রিত করিয়া সে আরাম কেদারার আশ্রয় লইল। ঔদাসীন্যের রুগ্ন আভাস তাকে ইতিপূর্ব্বে এরূপ নিঃসাড় করিয়া তুলিতে পারে নাই।

কিছুক্ষণ পরেই অনুপম ফিরিয়া আসিল। তার উপস্থিতি কবিতার মনে ও মনের বাহিরে কোনওরূপ ভাবান্তর আনিতে পারিল না। তেমনি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় সে শুইয়া রহিল।

—সত্যি কবি, তোমার সঙ্গে প্রদোষের বিয়ের কথা হ'য়েছিল? পাশের চেয়ারে নিজের দেহ প্রসারিত করিয়া দিয়া অনুপম জিজ্ঞাসা করিল।

—হ্যাঁ—

—কিন্তু হ'ল না কেন?

—তোমার বন্ধু বলেনি?

—না। জিজ্ঞেস অবশ্য ক'রেছিলুম। কিন্তু সে এড়িয়ে যেতে চায় দেখে আর পীড়াপীড়ি করিনি।

—সে কথা শুনে কাজ নেই।

—কাজ আছে ব'লেই জিজ্ঞেস ক'রছি। জানতে লোভ হ'য়েছে কবি, তাকে অপছন্দ ক'রে আমাকে পছন্দ করবার অন্তর্নিহিত হেতুটা।

—এর ভেতরে লুকান কথা একটাও নেই। এ কথা সবাই জানত। আমরাও দুজনে জানতুম আমাদের বিয়ে হবে। হঠাৎ মাঝখান থেকে

রটে গেল, আমার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। কথাটা তাঁদের দমিয়ে দিলে।

—প্রদোষ এ কথাটির সত্যাসত্য জানবার চেষ্টা করেনি ?

—তা কি ক'রে জানব ?

—তার মানে ? অনুপমের স্বরে বিস্ময় প্রকাশ পাইল।

—তার মানে, যখন বিয়ের কথা ভেঙ্গে গেল, তখন একদিন তোমার বন্ধু বাবার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। তাঁর আগমনের কারণ আমরা কেউই জানতুম না। আমার বিয়ের অনেক পরে বাবাকে একদিন বলতে শুনলুম নিজেকে মূল্যবান প্রতিপন্ন করবার জন্মেই তিনি সেদিন সকল বিধি-নিষেধকে অগ্রাহ্য ক'রে এগিয়ে এসেছিলেন। বাবা কিছুতেই মত বদলালেন না। যাঁদের মন অত সন্দিগ্ধ, তাঁদের সঙ্গে কুটুম্বিতা ক'রতে বাবা রাজী হ'লেন না। সেই দিন থেকে তোমার বন্ধুটি আমাদের বাড়ীতে আসা বন্ধ ক'রে দিলে। আর আমিও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করলাম।

চিন্তাকুলতার মধ্যেও কথাগুলি অনুপম শুনিয়া যাইতেছিল। কবিতা থামিতেই সে বলিল, তাই ও নারীকে ঘৃণা করে: তাই ও অকৃতজ্ঞ পৃথিবীকে গ্রাহ্য ক'রতে চায় না। নিজের জন্যে এক টুকরো পৃথিবী তৈরী ক'রে তার মধ্যে একা বাস করে। যেতে দেয় না তার মধ্যে কারুকে ; নিজেও সে তার সীমানা থেকে বাইরে আসে না।

ঘূর্ণী হাওয়া আসিয়া বন্ধ জানালাগুলো নাড়া দিয়া চলিয়া গেল।

অনুপম বলিয়াই চলিল, আজ বুঝতে পারছি কবি, কেন ওর সংসারে বিতৃষ্ণা ? কেন ওর তোমার কথা জানবার জন্মে অবিরাম একাগ্রতা ?

কবিতা চঞ্চল হইয়া উঠিল। করুণায়, অনুকম্পায় ও স্নেহে বিগলিত তার মন এই প্রথম বিদ্রোহী হইতে চাহিল। স্বামীর মুখের উপর নিলর্জ্জ দৃষ্টি প্রতিফলিত করিয়া সে বলিল, আমাকে তো একদিনো এ কথা বলনি ? আমি বরং শোনবার জন্যে কতদিন উৎসুক হ'য়ে

তোমার মুখের পানে তাকিয়ে থেকেছি, তুমি আমাকে ডাক্তার পালের উপদেশ শুনিয়ে প্রতিদিনই বোবা ক'রে দিয়েছ।

অনুপমের বলিতে ইচ্ছা হইল, তোমার মনের সন্ধান যদি আগে পেতুম কবি, শুধু তোমাকে ব'লেই নিজের কর্ত্তব্য শেষ ক'রতুম না; হয়তো আরো অনেক কিছু ক'রতে পারতুম। কিন্তু যে-কথাটি বুকের ভিতর হইতে বাহির হইতে চাহিল, সেই কথাটি ঠোঁটের কাছে আসিয়া আটকাইয়া গেল। অন্তরের অস্থিরতা বাহিরে প্রকাশ না করিয়া সে অসমাপ্ত উপন্যাসখানি খুলিয়া বসিল।

কবিতা উন্মত্ত আক্রোশ সহিতে পারিল না। নিরলস মুহূর্ত্তগুলো তাকে অনধিকার চর্চ্চায় ব্যাপৃত করিতেছে। সোয়েটারের সরঞ্জাম লইয়া সে পুনরায় টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

নীরব রাত নীরবেই অতিবাহিত হইতে লাগিল।

ভোর হইয়া গিয়াছে।

কাঁকরের রাস্তায় পদশব্দ সুস্পষ্ট হইবার পূর্ব্বেই কবিতা ঘুম হইতে উঠিল। অনুপমকে ডাকিয়া জাগাইল। পথ চলার অবিশ্রান্ত আনন্দে সে নিমগ্ন। গত রাত্রির যাবতীয় গ্লানি সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিল নির্ম্মম ভাবে। এখন তার অনুশোচনা হইতেছে, কেন সে নিজেকে কাল শাসনের মধ্যে আনিতে পারে নাই। হয়তো ইহাতে তার স্বামীর মনঃক্ষুণ্ণ হইতে পারে; হয়তো না-ও হইতে পারে। সে কেন সামান্য একটি উত্তেজনায় চিরজন্মের মত নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করিতে গেল? কেন তা সে-ও জানে না। তাই অন্য দিনের ন্যায় আজও অনাবশ্যক প্রশ্ন ও অবান্তর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সে যাত্রা সুরু করিল। অনুপমকে সব কথাই শুনিতে হয়। উত্তর না দিলে তার অব্যাহতি নাই। ইহাতে মনে মনে সে-ও আনন্দ অনুভব করে; কবিতাও খুসী হয়।

যতক্ষণ না সীতাগোড়া পাহাড়ের চূড়া ডিঙ্গাইয়া সূর্য্য উঠে, ততক্ষণ বেশ কাটে। তারপরই কবিতা বিমর্ষ হইয়া পড়ে। এইবার তাঁকে ফিরিতে হইবে। এই সময়টি কথার জাল বুনিয়া সে স্বামীকে ভুলাইতে চেষ্টা করে। অনুপম দিনের প্রখরতায় রাত্রির কোমলতা বিস্মৃত হয় না। এ বিষয়ে সে যথেষ্ট সচেতন। ডাক্তার পালের উপদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত মানিয়া চলিবে। ইহার জন্য যদি কবিতা তাকে ভুল বুঝিয়া থাকে, তার বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই। কবিতার আব্দার অপূর্ণ রাখা তার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু যেখানে জীবন-মরণেব কঠিন প্রশ্ন, সেখানে বাধা দেবার অধিকার তার আছে।

আজও কবিতা গল্প জুড়িয়ে দিল। ভাবিয়াছিল, কথার মাদকতা সৃষ্টি করিয়া সে স্বামীকে অন্যমনস্ক করিয়া দিবে। অনুপম তাই বলিয়া দুর্ব্বল নয়। নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে সে পারদপক্ষে দিবে না। অগত্যা কবিতাকে মাঝ পথেই ফিরিতে হইল।

গোরার মাঠে মায়ার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। কবিতা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এখুনি তাকে ঘরে ঢুকিতে হইবে না! মুহূর্ত্তে অসন্তোষের ছায়া তার মুখ হইতে মিলাইয়া গেল। মৃদু কলরবে নিকটের বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল।

অনুপমের দাঁড়াইয়া থাকা বৃথা। কতক্ষণে যে তাদের কথা ফুরাইবে, তার কোন নিশ্চয়তা নাই। পরশুদিনও তাদের এইখানে দেখা হইয়াছিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া তাকে একাই ফিরিতে হইয়াছিল। আজ কিন্তু তার আনন্দ হইল। এই ফাঁকে ফাঁকি দিয়া সে প্রদোষকে ডাকিয়া আনিতে পারিবে।

অনুপম যে আসিবেই, প্রদোষ তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছিল। তাই বন্ধুর আবির্ভাবে সে একেবারেই বিস্মিত হইল না। অতি সহজভাবেই বলিল, তুই আসবি জেনেই এতক্ষণ বেরুইনি।

—আমিও জানতুম তুই ঘর থেকে নড়বি না।

—আজ আর বেড়াতে বেরুসনি ?

—বেড়িয়েই তো ফিরছি !

—কবিতাকে রেখে এলি কোথা ? সে বুঝি এল না ?

—না রে না, তার এখানে বান্ধবীর অভাব।

—ওঃ ! ক্ষীণ হাসিয়া প্রদোষ থামিল।

—তোকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি। কবিতার হুকুম।

—কবিতা বলেছে ?

—হুঁ। না গেলে সে দুঃখ ক'রবে. একথাও জানিয়ে দিতে বলেছে।

—এথুনি কি ক'রে যাই ভাই। আমাকে যে একবার বেরুতে হবে।

সময়মত যাইবার নির্দ্দেশ দিয়া অনুপম দাঁড়াইয়া উঠিল। প্রদোষ তাহাকে জোর করাইয়া বসাইল। বন্ধুর কথা কোনদিন সে অবহেলা করে নাই। আজও করিতে পারিল না।

প্রদোষ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

অনুপম একটি মৃত হরিণের সজল চোখের পানে তাকাইয়া রহিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রদোষ ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে সাথীও চায়ের উপকরণ লইয়া উপস্থিত হইল।

অনুপম জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে চিনতে পার সাথী ?

সাথী আপন মনে বলিল, কেমন ক'রে চিনব বলুন ?

—কেন ? না চেনবার তো কোন কারণ ঘটেনি এরি মধ্যে। ভুলে গেছ তাই বল।

—না দেখলে লোকে ভুলেই যায়।

পেয়ালায় চুমুক দিয়া অনুপম বলিল, না সাথী, ভুলে যায় না। মানুষ মানুষকে ভুলতে পারে না।

মানুষ মানুষকে ভুলিতে পারে না, একথা সাথীও জানে। কিন্তু

তিন বছরের মধ্যে যে একদিন দেখা করিবার পর্য্যন্ত সময় পাইল না, সে যে ভুলিয়া যায় নাই, একথা আজ সে কেমন করিয়া বিশ্বাস করিবে? চুপ করিয়া সে পাশেই দাঁড়াইয়া রহিল। চুপ করা ব্যতীত তার কোন উপায়ও ছিল না। ইহার উত্তরে সে যাহা বলিতে পারিত, তাহা নিতান্তই অশোভন দেখাইবে। প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া সে জানাইল, বৌদিকে নিয়ে এলেন না কেন? বেশ গল্প করা যেত।

—সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে হবে না। খবর পেলে নিজেই আসবেখন। আলাপ ক'রতে সে খুব পটু।

—তাই ব'লে বুঝি নিয়ে আসতে নেই?

—বিকেলেই জ্বালাতনের বহরটা দেখতে পাবে।

—এই বনবাসে বৌদিকে পেলে তো বর্ত্তে যাই।

—এখন এই কথা বলছ, কিন্তু জ্বালাতনের জ্বালায় শেষ পর্য্যন্ত না অতিষ্ট হ'য়ে ওঠ।

কথাটি গায়ে মাখিয়া সাথী চলিয়া গেল। এখন তার গল্প করিবার সময় নাই। তিন মাসের অবর্ত্তমানে সংসারে অনেক অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে। অধিকাংশ গাছ শুকাইয়া গিয়াছে। টিয়ার খাঁচাটা বাগানের এক কোণে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তার অত সাধের চেয়ারখানি ভাঙ্গিয়া বারান্দার একাংশে পড়িয়া আছে। চাকরটা এতদিন কি কেবল নাক ডাকাইয়া ঘুমাইয়াছে? দূর করিয়া দিবে সে সনাতনকে। কারুর কোন কথা সে শুনিবে না। ঘরখানির যা অবস্থা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তার কান্না পায়। আসিয়া অবধি সে এক মিনিটও বিশ্রাম করিবার অবসর পায় নাই। সদাসর্ব্বদাই নিজেকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিয়াছে। তবু সে ঘরখানিকে সুবিন্যস্তভাবে গুছাইয়া উঠিতে পারে নাই। এত নোংরার মধ্যে থাকিতে তার গা ঘিন ঘিন করে। তার চলিয়া যাইবার পর হইতে ছবিগুলো একদিনও

মোছা হয় নাই। চারিদিক ঝুলে ভর্ত্তি। বইয়ের আলমারির মধ্যে বই নাই। সেখানে গ্রামোফোনের রেকর্ডগুলোর স্থান হইয়াছে। বইগুলো খাবার টেবিলের উপর স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। টেবিলে পুরু ধূলা জমিয়া উঠিয়াছে। ফুলদানিটি খাটের তলায় আশ্রয় লইয়াছে। এতদিন যে লোকটি এখানে বাস করিতেছিল, সে যে চোখ বুজাইয়া বাড়ীতে ঢুকিত, একথা কে না বলিবে? সমস্ত বিশৃঙ্খলা তাকে একা ঘুচাইতে হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই যে তাকে সাহায্য করিতে আসিবে। চাকরটা আছে বটে; কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে। এতদিন থাকিয়াই বড় করিয়াছে।

বিভূতির কথা স্বতন্ত্র। বাড়ীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কেবল খাবার আর শোবার। সময়ে খাইতে পাইলে সে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। ঘুম পাইলে শুইবার বিছানা থাকিলে তার আর কিছু দরকার হয় না। শীকার লইয়াই মাতিয়া আছে। একদিন ছুটি পাইয়াছে কি অমনি বন্দুক লইয়া বাহির হইয়াছে। সংসারের প্রতি যদি তার এতটুকু দরদ থাকিত, সাথীকে নিবিড়ভাবে সংসারে লিপ্ত থাকিতে হইত না।

অনুপম উঠিবার সময় বিভূতির অদর্শনের কারণ জানিতে চাহিল।

প্রদোষ বলিল, তার নেশার কথা আর বলিসনি। কাল রাত্তিরে শীকারে বেরিয়েছে, এখনো পর্য্যন্ত দেখা নেই। শীকার ক'রে দেশোদ্ধার ক'রবে আর কি? যত সব পশুবৃত্তি। সাথী ক'মাস ছিল না: সুবিধেই হ'য়েছিল। খুব শীকার ক'রে বেড়িয়েছে। দেখবি চ না তার কীর্ত্তি।

অনুপম ব্যগ্র হইয়া বন্ধুর অনুবর্ত্তী হইল। পাশের ঘরখানায় বাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া নীলগাই, হরিণ, হায়না কিছুরই অভাব নাই। মৃত জন্তুর শেষ কাতর চাহনি কি করুণ, কি মর্ম্মন্তুদ!

অনুপম অমন জানিলে আসিত না। উহাদের আর্ত্ত চোখ তাকেও

দুঃখে অভিভূত করিল। অন্য ঘর দেখিবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া সে সোজা রাস্তায় নামিয়া আসিল।

প্রদোষ তাকে বাধা দিল না। এই অবসরে সে বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া আসিবে। আজই সে যাত্রা করিতেছে।

ফিরিবার মুখে কবিতার কথাই অনুপম চিন্তা করিতেছিল। না জানি, সে আজ কতখানি মুখরা হইয়া উঠিবে।

অনুপম ভুল ভাবিয়াছিল। কবিতা বাচাল নয়। স্বামীকে আসিতে দেখিয়া সে একটি কথাও বলিল না। যেমন বসিয়াছিল, তেমনি নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল।

অনুপম জিজ্ঞাসা করিল, চা খাওয়া হ'য়ে গেছে কবি?

কবিতার আচরণে কোন বৈলক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

অনুপম পুনরায় প্রশ্ন করিল, চা খাবে না?

কবিতার নিরুত্তর স্তব্ধতা যেন অনুপমকে ব্যঙ্গ করিল। কাল রাত্রে সে যে ঝড় দেখিয়াছে, মনে মনে তার ভীষণ আকার কল্পনা করিয়া সে নিরস্ত হইল।

ঘড়িতে ন'টা বাজিল।

কবিতা এতক্ষণ পুতুলের মত বসিয়াছিল। মনকে যখন সে খুসী করিতে পারিল না, বেশ পরিবর্ত্তনের জন্য দাঁড়াইয়া উঠিল।

অনুপমের পড়াতে মন ছিল না। বই হইতে মুখ তুলিয়া কবিতাকে ডাকিল।

কবিতা মৌনতা অবলম্বন করিয়া নিকটে আসিল।

—কি তোমার অভিযোগ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কবি? অনুপম জানাইল।

—অভিযোগ আমার নেই। তুমি শুধু তোমার বন্ধুকে এখানে ডেকে এনো না। তোমার পায়ে পড়ি।

—তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? বিয়ের কথা বলছ? অমন কত মেয়ের সঙ্গে আমারো কথা হ'য়েছিল।

—তবু তাঁকে তুমি এই ঘরে ডেকে নিয়ে আসতে পাবে না। আমি তাঁকে আসতে দোব না। কবিতা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। যে-রিক্ততা এতদিন সে গোপনে উদ্দীপিত করিয়া রাখিয়াছিল আজ তাহা প্রকাশ করিতে তার বুকে ব্যথা লাগিল যত, বেদনায় নীলাভ মুখখানা ততই কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। পাঁচটি বছরেও যে তার মনকে জানিতে দেয় নাই: প্রতিদিন নিজেকে রহস্যময়ী করিয়া তুলিয়াছে; সে আজ সামান্য একটি আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। না-পারার জন্য তার ক্ষোভের অন্ত ছিল না; অনুশোচনা সীমা অতিক্রম করিল। কেন সে স্বামীকে কেন্দ্র করিয়া নূতন স্বর্গ গড়িয়া তুলিতে পারিল না? কেন, কেন? নিজের অক্ষমতায় সে কাঁদিয়া ফেলিল।

—কাঁদছ কেন কবি?

—কাঁদছি নিজের কথা ভেবে। আমাকে তুমি কোলকাতায় নিয়ে চল। এখানে থাকলে সারতে পারব না।

—কেন কবি? প্রদোষ এসেছে ব'লেই কি?

—তা জানি না।

—কই; একথা তো এর আগে একদিনো তোমার মুখে শুনিনি।

—তখন দরকার হয়নি।

—দরকার কি একদিনেই এসে পড়ে? নিতান্ত কচি খুকিটি তুমি নও! অনেক কিছু বোঝবার বয়েস এখন তোমার হ'য়েছে। জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার দিন তোমার কেটে গেছে। তবে কেন তুমি নিজেকে বিশ্বাস ক'রতে পারছ না? প্রদোষকে যদি ডেকেই আনি এখানে, তোমার অভিমান করবার কি আছে? আর তার সামে বেরুতে তোমার সঙ্কোচই বা কিসের? তুমি চল কবি, তার সঙ্গে

নতুন ক'রে তোমার পরিচয় করিয়ে দি।- দেখবে, মনের ক্ষুব্ধতা তোমার মুছে যাবে।

অনুপম ভাবিয়াছিল, কথাগুলো কবিতার মুখে খুসীর উৎসব জ্বালাইয়া দিবে। কিন্তু কোন পরিবর্ত্তনই তার মুখে ফুটিয়া উঠিল না। সে শুধু অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

—এখুনি যেতে হবে কবি, নইলে তোমার মনের এ কাঙালপণা কোনদিন ঘুচবে না।

কবিতার দীর্ঘদৃষ্টি সহসা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। ঘরের মাঝখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, পাশে সরিয়া আসিল।

দরজার বাহিরে প্রদোষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, অনুপম, যেতে পারি আমি ?

অনুপম শুধু আসিবার অনুমতি দিল না, সঙ্গে সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে আনিল।

প্রদোষ বলিল, এসে দেখছি অন্যায় ক'রেছি।

ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ এসময়ে নিরর্থক। বিপর্য্যয়ের যে পূর্ব্বাভাষ দেখা দিয়াছে, তাহা দূরীকরণ করিতে না পারিলে অনুপম না পাইবে জীবনধারণের উপজীব্য, না পাইবে বাঁচিবার উত্তেজনা। বৃথা সময় নষ্ট করিতে তার মন চাহিল না। কবিতাকে নির্দ্দেশ করিয়া সে বলিল, চিনতে পারিস একে ?

—হুঁ। প্রদোষ সিগারেট ধরাইল। খুব চিনি।

—তাহলে আর নতুন ক'রে পরিচয় করিয়ে দেবার দরকার হবে না।

প্রদোষ বিরাট ঘাড় নাড়িল। তার মনে হইল, কবিতা তাকে উপহাস করিতেছে না কি? তাচ্ছিল্য দেখাইতেছে না তো তার ভীরু মনকে, যে-মন একদিন আবেগে ঘন হইয়া উঠিয়াছিল: যে-মন একদিন বলিতে দ্বিধা করে নাই; তোমাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা যায়

কবিতা। এই ক্লেদময় জীবনের উপর পরস্পরের অটুট বিশ্বাসময় ভালবাসা? আর কি ভালবাসায় জীবন ধন্য করা যায় না? সেদিনের আকুল অকৃত্রিমতাকে কবিতা ভুল বুঝিয়াছিল। আজও তার মর্ম্মর মর্ম্ম সেই কথাগুলি ভুলিতে পারে নাই।

অনুপম বলিল, তোরা ততক্ষণ গল্প কর, আমি মুখুজ্জ্যে সাহেবের বাড়ী থেকে বইখানা বদলে আনি।

প্রদোষ বলিল, চ, আমিও উঠি। আমাকে আবার এইট্ ডাউনে ফিরে যেতে হবে।

—কেন? রাত্রের প্যাসেঞ্জারেও তো যেতে পারিস? অনুপম বলিল, রাত দশটায় পৌছুনও যা, ভোরে পৌছুন—একই কথা।

—এই ঘণ্টা কয়েক থেকেই বা আমার লাভ কি?

—লোকসান আছে বলতে পারিস?

—লোকসান না থাকলেও আমাকে যেতে হবে। টেলীগ্রাম ক'রে দিয়েছি। না গেলে মা ভাববে।

প্রদোষের চলিয়া যাইবার কথা শুনিয়া কবিতা মরিয়া হইয়া উঠিল। এই শুভ-মুহূর্ত্তটি হয়তো তার জীবনে আর কোনদিন আসিবে না। নিজেকে গণ্ডীর বাহিরে ছাড়িয়া দিয়া সে বলিল, এ রকমভাবে আসবারই বা আপনার কি এমন দরকার পড়েছিল।

—আসবার আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। শুধু বিভূতির জন্যে—

—চা খেয়ে যেতে আপত্তি নেই তো? কবিতা নড়িল।

অনুপম বলিল, আপত্তি আমারো নেই।

—চলে যাবেন না যেন! কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া কবিতা চলিয়া গেল। যে-ভীরুতা তাকে সদাসর্ব্বদা নিস্তেজ করিয়া রাখিত, আজ তার অবসান ঘটিতে দেখিয়া তার হৃদয় উৎফুল্লতায় নাচিয়া উঠিল। আজ হইতে মনের ক্ষীণতম ক্ষুণ্ণতাও তাকে সহ্য

করিতে হইবে না। সুন্দর পৃথিবীতে সুষ্ঠুভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে।

ঘরখানি আবার মৃদু গুঞ্জরণে মুখরিত হইয়া উঠিল। কতকাল পরে দেখা। শুধু তাহাই নহে। আবার কতদিন পরে দেখা হইবে, তাহার কিছু নিশ্চয়তা নাই।

কবিতা শুধু চা আনিল না। ঠাকুরকে তাড়া দিয়া সে লুচি ভাজাইয়াও লইয়াছিল।

প্রদোষ বলিল, ক'রেছ কি কবিতা? এত খাব কি ক'রে?

—রোজ তো আর খেতে বলব না? কবিতা প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

—এ তোদের জুলুম, অনুপম।

—আমাকে না বলে জুলুমকারিণীর সামনেই বলিস।

—বলবই তো?

—বেশ তো, কে বারণ ক'রছে? এখন শুধু শুধু চা-টা ঠাণ্ডা করে লাভ কি বল? না খেয়ে কবিতার কাছে পার পাবি ভেবেছিস?

সহজে নিস্তার যে মিলিবে না তাহা প্রদোষ জানে।

পুড়িংয়ের রেকাবী টেবিলে নামাইয়া দিয়া কবিতা প্রশ্ন করিল, কই, কিছুই তো খেলেন না?

প্রদোষ জবাব দিল, তোমার কথার অপেক্ষায় আমার খাওয়া বন্ধ ছিল না কবিতা।

—সবই তো পড়ে রইল। আপনার পাশের লোকটি নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে আপনি আছেন, একথা বোধ হয় ভুলে গেছে।

অনুপম বলিল, দেখছিলুম তোমার অতিথি সেবার বহরটা। নেমনতন্ন কি আমি ক'রেছিলুম!

—কিন্তু কার মুখ চেয়ে উনি এসেছেন?

—সে কথা মীমাংসা করা তো এমন কিছু বড় কথা নয়। প্রদোষ তো সামনেই রয়েছে।

প্রদোষ মহামুস্কিলে পড়িল। যে-শূন্যতা তা'কে এতদিন মৃত করিয়া রাখিয়াছিল, আজ এই অতর্কিত সন্ধিক্ষণে সেই সমুপস্থিতি বাঁচিবার দাবিকে বলবতী করিয়া তুলিল। যে-নারীটি তার পৃথিবীকে ভালবাসিবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাকে নারীত্বের সুপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে বসিতে দেখিয়া তার আনন্দ হইল প্রচুর। অম্লানকণ্ঠে তাই সে বলিল, আমাদের বন্ধুত্ব কি আজকের ?

কবিতা বলিল, তাই বুঝি আপনার বন্ধুর এই উদাসীনতা ?

প্রদোষ বলিল, উদাসীনতা অনেকক্ষেত্রে আন্তরিকতাকে আরো ঘনিষ্ঠতর ক'রে বেঁধে দেয়।

ইহার পর আর কোন কথা জমিল না।

বেশ একটা নীরবতার সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই নিস্তব্ধতার মাঝখানে প্রদোষ সহসা বলিয়া উঠিল, এবার ওঠা যাক। এগারটায় বাস্ আসবে, বলেছে।

—আবার আসবেন। কবিতা অসঙ্কোচে জানালে, আপনার তো আর এখানে থাকবার জন্যে ভাবতে হবে না।

প্রদোষের আর অপেক্ষা করা চলিবে না। দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

—এরকম ভাবে আপনার আসাই বা কেন আর চলে যাবার জন্যে এত তাড়াই বা কিসের, কিছুই বুঝতে পারলুম না।

—এমন জানলে থেকেই যেতুম। যত্ন-আত্তি এত পেলে কি মন যেতে চায় ? প্রদোষ পা বাড়াইল।

কবিতা শিশুর মত পুলকিত হইয়া উঠিল। বলিল, এইবার যত্ন-আত্তি করবার একজন লোক আনুন না ?

—যেদিন বুঝব নিজের অতীতকে গলা টিকে হত্যা ক'রতে

পেয়েছি, সেদিন কবিতা তোমার কথাই সকলের আগে মনে পড়বে।

বন্ধুর করমর্দ্দন করিয়া প্রদোষ অগ্রসর হইল। দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া মৌখিক ভদ্রতায় সে ফিরিয়া তাকাইল। কবিতার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তার সমস্ত শরীরের ভিতর একটি অভিভূত রোমাঞ্চ বহিয়া গেল। তার মনে হইল, সে পুনরায় না আসিলে হয়তো কবিতার চোখ দু'টি আরও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করিয়া সে একদিন জীবনের উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছিল, তাকে পাইল না বলিয়া তার আজ বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই। তার দুঃখ কেবল এই কারণেই যে, দেবতারা তাহার নিকট মাটির বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, সে ফিরিয়া আসিলে তারা কি আবার প্রাণময় হইয়া উঠিবে?

জীবনের জলস্রোতে

অতি সাধারণ একটি বস্তি।

যে সকল অভাব অভিযোগ জীবনকে দুর্ব্বিষহ ক'রে তোলে, বেঁচে থাকবার অধিকার থেকে নিজেদের প্রতিনিয়ত বঞ্চিত করে, হাজার নিষ্পেষণের মধ্যে প্রতিবেশীদের অমানুষ ক'রে ফেলে, এখানে সে সব কিছুই নেই। পালেদের দিঘী ছাড়াও সরকারী জলের কল আছে। পাকা রাস্তা আছে। রাস্তায় আলো জ্বলে: ঝাঁট পড়ে নিয়মিত।

বাস করে এর মধ্যে অনেকগুলি পরিবার। মানুষগুলোকে দেখলে দুঃখ হয় না, ঘৃণা হয় না, মমতা হয়। এদের মধ্যে হয়তো কত গান্ধী, কত ভিঁ, ভ্যালেরা, কত সান্-ইয়েত-সেন জন্মগ্রহণ ক'রেছে, যারা বাঁচবার অধিকারে শুধু মত্ত। দিনকে ফাঁকি দিতে পারার মধ্যে এরা উজ্জ্বল আনন্দ অনুভব করে। নির্জ্জন অন্ধকার আর নিরুপদ্রব জীবন এদের প্রতিদিনের আগ্রহকে বাড়িয়ে চলে। এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। কেউ কারুর কথায় থাকে না। সকলে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের গল্প কিন্তু সকলকে নিয়ে নয়। যে দু'টি পাশাপাশি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠভাবে ঘনিয়ে উঠেছে যে একটির কথা বলতে গেলে অপরটি আপনা হ'তেই এসে পড়ে শুধু তারাই থাকবে এই গল্পের মধ্যে। প্রথম পরিবারটি: স্বামী ও স্ত্রী, পাঁচু আর নলিনী এবং দ্বিতীয়টি: মা ও ছেলে, নিস্তারিণী আর নারাণ।

গল্পের যবনিকা যখন উঠল, আমরা দেখতে পেলুম পাঁচু রোগশয্যায় শুয়ে। মাথার শিয়রে নলিনী অসহায়ভাবে বসে রয়েছে।

পাঁচু বলছে, আমাকে বাঁচাও নলিনী, আমি মরতে চাই না।

নলিনী উত্তরে জানালে, অত ভেব না; ভাবলে অসুখ কমবে না।

পাঁচু বললে, কোনদিন ভাবিনি নিজের জন্যে; আজো যদি না ভাবব আর কি দিন পাব?

নলিনী বললে, পাবে।

নারাণ পরনের কাপড়খানার অর্দ্ধেকটা গায়ে জড়িয়ে ঘরে ঢুকল। মুখে তার দারুণ উদ্বিগ্নতা; চোখে তার ব্যস্ত ব্যাকুলতা।

নলিনী তাকে দেখতে পেয়ে সহসা প্রশ্ন ক'রে বসল, আজ কোথায় গিসলে নারাণ? মাসীমাকে জিজ্ঞেস করলুম, তিনিও কিছু বলতে পারলেন না।

নারাণ তেম্নি বিমর্ষ হ'য়ে বললে, চাকরীর সন্ধানে বৌদি। কতদিন আর বসে থাকব তুমিই বল না? বুড়-মা পরের বাড়ী ঝি-গিরি ক'রে কি চিরদিনই খাওয়াবে?

এত দুঃখের মধ্যেও নলিনীর মুখখানা আনন্দোজ্জ্বলে রাঙা হ'য়ে উঠল।

নারাণ পাঁচুর কপালে হাত দিয়ে দেহের উত্তাপটা অনুমানে এঁচে নিয়ে বললে, আজ আর বোধ হয় জ্বর আসেনি না বৌদি?

নলিনী জবাব দিলে, কি ক'রে জানব বল? থারমিটার দিয়ে কি দেখতে জানি!

—না, না সে কথা বলছি না বৌদি। নারাণ অপ্রস্তুত হ'য়ে জানালে, গায়ে হাত দিয়ে তোমার কি মনে হয়।

—হ্যাঁ, আজ যেন ওরি মধ্যে একটু কম আছে বলেই মনে হ'চ্ছে।

—ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছেন, একুশ দিনের পর জ্বর ছেড়ে যাবে। আজ কত দিন বৌদি?

—ঠিক সতেরো দিন।

—দেখ আর জ্বর আসবে না। ডাক্তারবাবুর কথা কি মিথ্যে হবে ?

নলিনী বুকে বল পেলে। আনন্দের আতিশয্যে তার ভগ্ন অন্তর একটুখানি দুলে উঠল। স্বামীকে সে এবারও তাহ'লে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে।

পাঁচু এতক্ষণ নিঝুম হ'য়ে পড়েছিল। অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ ক'রে বলে উঠল, মাথার ভেতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে ভাই।

—জল-পটি দিলে এখুনি কমে যাবে পাঁচুদা। সেদিন তো দেখলে!

পাঁচু আশ্বস্ত হ'ল। নলিনী উঠে গিয়ে ন্যাকড়ার ফালি ছিঁড়ে এনে জলে ভিজিয়ে স্বামীর কপালে লাগিয়ে দিলে।

নারাণ বললে, আমি এখন বসছি। এই বেলা তুমি নিজের কাজ সেরে নাও গে বৌদি।

নলিনী সর্ব্বক্ষণ এই অন্ধকার স্থানটিতে থেকে থেকে আলোর দিকে যেতে চায় না। আজ দু'দিন সে রান্নাঘরে ঢোকেনি। খেতেও তার প্রবৃত্তি হয়নি। স্বামীকে আজ অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখে সে রান্নার সন্ধানে গেল।

পাঁচু বললে, ও-ও বাঁচবে না নারাণ। না খেয়ে মানুষ কতদিন বেঁচে থাকতে পারে। আমার কথা তো ও কিছুতেই শুনবে না! তুই যদি বলিস, ও তোর কথা ঠেলে দিতে পারবে না।

নারাণ হাঁক দিয়ে নলিনীকে ডাকলে। সে ভয়ে ভয়ে তার পাশটিতে এসে দাঁড়াল।

—তুমি নাকি দু'দিন কিছু খাওনি ?

নলিনী চুপ ক'রে রইল।

—তুমিও দেখছি শেষ পর্য্যন্ত রোগে পড়বে! উপোস ক'রে ক'দিন কাটাবে। তুমি যাও বৌদি, এইবেলা দু' মুঠো ফুটিয়ে নাও গে। যতক্ষণ না তোমার রান্না হবে, আমি এখান থেকে উঠব না।

স্নেহের শাসন নলিনী কোনদিন অগ্রাহ্য করেনি। আজো ক'রলে না। ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সকাল গড়িয়ে সন্ধ্যে হ'ল। আকাশে চাঁদ উঠল। ঘরে প্রদীপ জ্বলল। বস্তিতে কোলাহলের রব উঠল। দিন মজুরের দল এরা। সারাদিনের কাজের পর বাড়ী ফিরে এল সবাই প্রচুর প্রত্যাশা নিয়ে।

নলিনী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকতেই নারাণ শুধালে, এরিমধ্যে রাঁধলেই বা কখন আর খেলেই বা কখন?

নলিনী হাঁ ও না কিছুই বললে না। অসহায় দৃষ্টি-প্রদীপ সাবধানে জ্বালিয়ে স্বামীর শয্যাপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়াল। নারাণের অনুমান মিথ্যে হ'ল না। ঘরে চাল নেই। ঠোঙায় যে ক'টি ছিল, ইঁদুরে তা নষ্ট ক'রে দিয়েছে।

—তোমার দেখছি কোনদিনই হুঁস হবে না বৌদি। সেদিনো তো এম্নি হ'য়েছিল। নারাণের স্নেহের অত্যাচার সুরু হ'ল।

নলিনী নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

—কি খাবে এখন? একটু সাবধান হ'লে তো আর ইঁদুরে নিয়ে যেতে পারত না।

নলিনী তবুও নিরুত্তর।

নারাণ আর সেখানে এক মুহূর্ত্ত রইল না। বাসায় গিয়ে সে দেখলে মা ইতিমধ্যে কাজ সেরে বাড়ী ফিরে এসেছে। দাওয়ায় সে মার পাশে গিয়ে বসল।

নিস্তারিণী জিজ্ঞেস ক'রলে, পাঁচু কেমন আছে রে নারাণ?

নারাণ ঘাড় নেড়ে জানালে, ভালই। আজ আর জ্বর আসেনি।

—আহা-হা, বেঁচে উঠুক। নইলে নলিনী কি নিয়ে থাকবে?

উনানের ধোঁওয়া কমে আসতে দেখে নিস্তারিণী সেইদিকে যন্ত্র-চালিতের মত এগিয়ে গেল।

নারাণ বললে, বৌদি মা আজ দু'দিন কিছু খায়নি। তার জন্যেও এক মুঠো চাল নিও তো! না খেয়ে খেয়ে শেষ পর্য্যন্ত ও-ও দেখছি রোগে না পড়ে ছাড়বে না। বলতো মা, ওর ওপর রাগ ধরে কিনা? খুব বকে দিয়েছি আজ।

নিস্তারিণীর সমবেদনা উথলে উঠল। মৃদু তিরস্কার ক'রে বললে, আহা-হা, বকতে গেলি কেন বাপু। ওর দুঃখু শুধু ও-ই জানে।

নারাণ নিজেকে অপরাধী ঠাওরালে।

নিস্তারিণী আজ আর খাবে না।

চাটুর্য্যেদের বড় ছেলে মোহিতের আজ পাকা দেখা। ছোট-বউমা তাকে কিছুতেই ছাড়লেন না, না খাইয়ে। অবেলায় খেয়ে এল্লা তার খেতে আর রুচি নেই। দাওয়ায় মাদুরখানা বিছিয়ে সে বিশ্রাম সুখ উপভোগ ক'রছিল। সারাদিন আজ তার খাটুনি গেছে প্রচুর। শরীরটা কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে। অবসন্নতা তাকে এতদূর পেড়ে ফেলেছে যে অল্পক্ষণ মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। নারাণ এসে খেতে বসল, তখনো তার ঘুম ভাঙ্গবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এরূপ গাঢ় নিদ্রা সে বহুদিন উপভোগ ক'রতে পারেনি। ভয় আর ভাবনা দুই-ই তার চিরদিন শত্রুতা ক'রে এসেছে। বেশ ঘুমুচ্ছিল সে। ছেলের ক্রমাগত ডাকে তার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটল। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বাবা। এই বয়সে কি অত খাটা-খাটনী সয়!

নারাণের মন ব্যথায় ভিজে উঠল। যার জন্য সে মাকে জাগিয়ে তুললে, সে কথা আর শোনান হ'ল না। আঁচিয়ে সে মার পাশে এসে বসল।

নিস্তারিণী বললে, পাঁচুর ওখানে এখন আর যাবি না তো?

—পাঁচুদা তো আজ ভালই আছে মা? আর গেলেও তো বৌদিকে ঘর থেকে নড়াতে পারব না।

—তবে শুয়ে পড়। কাল থেকে তো আবার কাজে বেরুতে হবে।

কাজের কথা মনে হ'তেই অনন্ত আশা নারাণের বুকে জমা হ'ল। সে তাই নিয়ে নাডাচাড়া ক'রতে লাগল।

মায়ের অন্তর অজানিত আশঙ্কায় ভারী হ'য়ে উঠল। আনন্দের পরিবর্ত্তে তার চোখে মুখে দুশ্চিন্তাই বেশী প্রকাশ পেলে। ছেলেকে সতর্ক ক'রে দিয়ে সে বললে, সেখানে খুব সাবধানে কাজ করিস বাবা! যনত্তর-পাতি নিয়ে কাজ। হাবলার হাতখানাই তো বাদ দিতে হ'ল। মনিব ভাল, তাই পাঁচ টাকা ক'রে মাসোহারা পায়। নইলে শুকিয়ে মরতে হ'ত।

—আমাকে সে কাজ ক'রতে হবে না। তুমি নিশ্চিন্দে থেক।

—তবে যে লালবেহারী বলছিল, ঐ কাজই তোকে ক'রতে হবে।

নারাণ হো-হো ক'রে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে সে বললে, লালবেহারীদা তোমায় ভয় দেখিয়েছে মা।

এমন সময় সসব্যস্তে নলিনী এসে হাজির।

উৎসুক-ভরা দৃষ্টি তুলে নারাণ জিজ্ঞেস ক'রলে, কি মনে ক'রে বৌদি?

—একবার শীগগির চল। কেমন যেন হ'য়ে গেছে।

নারাণ তখুনি ছুটে বেরিয়ে গেল। নলিনীর পিছন পিছন নিস্তারিণীও এগিয়ে চলল। সমস্ত অবসাদ তার মন থেকে মুছে গেল নিমেষে। বস্তির মধ্যে ওই একটি মানুষের প্রতি তার মমত্ববোধ যেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। নিজের ভাবনা কে ভাবে তার ঠিক নেই, ওর ভাবনা ভাবতে ভাবতেই তার প্রাণ ওষ্ঠাগত। ওর মঙ্গল কামনায় পাঁচটা পয়সা সে তুলসী গাছের তলায় পুঁতে রেখেছে, ও সেরে উঠলে

হরির লুট দিয়ে সে দেবতার ঋণ শোধ ক'রবে। ওর জীবনের মূল্য তার কাছে অনেক বেশী। ও একদিন তাকে বাঁচিয়েছে, একথা সে কোনদিন ভুলবে না। তাই ওকে বাঁচিয়ে তোলবার একাগ্রতা তার চিত্তে এনে দিলে নতুন উৎসাহ, নব উদ্দীপনা।

পাঁচুর গা পুড়ে যাচ্ছিল। নারাণ এক ফালি ন্যাকড়ায় ওডিকোলন জবজবে ক'রে ভিজিয়ে তার কপালে লাগিয়ে দিয়ে একমনে ভাবছিল। এত রাত্রে সুকোমলবাবুকে ডেকে আনতে যাওয়া সমীচীন হবে কি না? একেই তো তাঁর ওপর অত্যাচারের সীমা নেই। যখনই প্রয়োজন হ'য়েছে, তিনি রোগীকে দেখে গেছেন, বিনা পয়সায় ওষুধের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন এখন ডাকতে গেলে তিনি বিমুখ ক'রবেন না। কিন্তু শুধু শুধু তাঁকে ডেকে এনে বিব্রত ক'রতে নারাণের মন চাইল না। সেদিন তো তিনি স্পষ্টই জানিয়ে গেলেন, জ্বর বাড়াটা এ রোগে মারাত্মক নয়। বরং অন্য উপসর্গগুলো যাতে না দেখা দেয়, সেই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করাই বিধেয়।

সুকোমলবাবুর কথাগুলো ভেবে নারাণ অনেকখানি সুস্থ হ'ল। যে-দুর্ভাবনার ছায়া তার সমস্ত মুখখানিতে ফুটে উঠেছিল, তা আর রইল না। আর সাতটা দিন কাটলে সে-ও বাঁচে, নলিনীও নিষ্কৃতি পায়।

নিস্তারিণী বিছানার কাছে এগিয়ে এসে ভীত দৃষ্টি তুলে পাঁচুর মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

নারাণ মায়ের অন্তরের ব্যাকুলতা জানতে পেরে বলে উঠল, ভয়ের কিছু নেই মা। জ্বরটা হঠাৎ বেড়ে গেছে তাই বেহুস হ'য়ে পড়েছে।

ভুঁইয়ে বসে নিস্তারিণী বাতাস ক'রতে লাগল। নলিনী পুতুলের মত এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

থারমোমিটারে জ্বর দেখে নিয়ে নারাণ স্বাভাবিক গলায় বললে, তুমি শোও গে মা। আমি হাওয়া ক'রছি।

নিস্তারিণীর নড়বার কোন সুলক্ষণ দেখা গেল না। একান্ত একরত হয়ে সে পাখাখানা নাড়িয়েই চলল। পাঁচুকে এ অবস্থায় ফেলে অন্যত্র গিয়েও সে স্বস্তি পাবে না। মন তার এই ঘরের মধ্যেই ঘুরে বেড়াবে। ওকে সে পেটে ধরেনি বটে কিন্তু নারাণের চেয়ে কোন অংশে তাকে কম ভালবাসে না। ওর কাছে সে ঋণী। ওর ঋণ কোনদিন সে শুধতে পারবে না।

নারাণ পুনরায় বললে, শুধু শুধু তিনজনে জেগে কি লাভ? রাত যদি জাগতেই হয়, পালা ক'রে জাগাই ভাল।

নিস্তারিণীর পক্ষ থেকে কোন উত্তর এল না। অষ্টমী পূজোর রাত্রে যে ভীষণ দুর্য্যোগ ঘনিয়ে এসেছিল তার জীবনে সে-কথা সে কোনদিন ভুলতে পারবে না। তার তখন নড়বার ক্ষমতা ছিল না। চাটুর্য্যেদের কলতলায় পড়ে গিয়ে কোমরের ব্যথা নিয়ে সে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে। শুয়ে শুয়ে সে শুনতে পেলে, বেলু আর দুলোকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে সার্ব্বজনীন তলায় কোন মেয়ের গলা থেকে হার চুরির অপরাধে। নারাণও গিসল তাদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে, সে অতশত জানত না। পুলিস তাকেও ছাড়লে না। শুধু চোখের জল ফেলা ছাড়া তার দ্বারা তখন আর কিছু সম্ভব হয়নি। সেই দুর্দ্দিনে যেমন ক'রেই হোক না কেন, পাঁচুই তো বাঁচিয়ে দিয়েছিল তাকে। সে যদি পর ভেবে সেই সময়ে নিজে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে না পড়ত; তাকে ফিরিয়ে আনবার আপ্রাণ চেষ্টা না ক'রত; আজকের এত উৎসাহ, এত উদ্দীপণা কি তার জীবনে সংযোজিত হ'য়ে বেঁচে থাকবার দুর্ব্বল আশাকে বলবতী ক'রে তুলতে পারত? এর বেশী সে ভাবতে পারলে না। একথা মনে পড়তেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। হাতের পাখা মুহূর্ত্তের জন্যে নিশ্চল হয়ে এল।

নারাণ চুপ ক'রে বসে রইল। নলিনীকে বসবার কথাও বললে

না ; ওষুধ খাওয়ান হ'য়েছে কি না সে কথাও জিজ্ঞেস ক'রলে না। মাকে বললেও যে যাবে না, এর প্রমাণ সে বহুদিন পেয়েছে। শুধু বসে থাকা ছাড়া তার এখন করবারই বা কি আছে ?

ঘরখানি প্রাণহীন নিঃসাড়তায় ডুবে রইল।

পাঁচু এতক্ষণ নির্জীবের ন্যায় নেতিয়ে পড়েছিল। এইবার যেন প্রাণের সাড়া তার মধ্যে প্রকাশ পেলে। ইঙ্গিতে জল খাবে জানালে। কুকড়ে শুয়েছিল, পা দুটো লম্বা ক'রে ছড়িয়ে দিলে। অল্প অল্প ঘামও দেখা দিল। হয়তো জ্বরটা ছাড়ছে। ছাড়লে সবাই বাঁচে। চব্বিশ ঘণ্টা মনে একটা অশান্তি পুষে নিশ্বাস নিয়েও কারুর সুখ নেই।

বস্তি ঝিমিয়ে পড়েছে। ফগুয়ার মাদল থেমে গেছে। তাড়ির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেছে কখন।

নারাণ আস্তে আস্তে ডাকলে, পাঁচুদা, ও পাঁচুদা—

পাঁচু তার পানে ঝাপসা দৃষ্টি তুলে তাকালে।

—কষ্ট হচ্ছে বুঝি খুব !

হাত নেড়ে পাঁচু জানিয়ে দিলে যে, তার কিছুই হচ্ছে না।

—তুমি এবার ঘুমোবার চেষ্টা কর পাঁচুদা।

পাঁচু চোখ বোজালে।

আরো অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর নলিনী বললে, এবার তুমি শোওগে নারাণ। মাসীমা তোমার জন্যে শুতে পারছেন না। ওঁকে তো আবার সেই রাত থাকতে উঠতে হবে। আমি তো জেগেই রয়েছি। ঘুম পেলে তোমায় ডেকে আনবখন।

নারাণ মার হাত ধরে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে নারাণের ভাল ক'রে ঘুম হল না। বাকী রাতটুকু তার দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল।

ভোরেই নারাণ বিছানা ছেড়ে উঠল। চোখ দু'টো দু'হাতে রগড়ে

নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। পাঁচু তখন অকাতরে ঘুমুচ্ছে। থারমোমিটার দিয়ে সে দেহের উত্তাপ পরীক্ষা ক'রে বললে, একশ'র কম আছে এখন বৌদি।

নলিনী জানালে, রাত্রে কিন্তু বড্ড ভুল বকেছে।

—জ্বরের মুখে সবাই ওরকম বকে। ও কিছু নয়। নারাণ নলিনীর সম্মুখে একরাশ আলো ছড়িয়ে দিলে।

নলিনী বুকে বল পেলে। তার চোখে নারাণ নারায়ণ।

বস্তি জেগে ওঠবার পূর্ব্বেই নারাণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এইবেলা জল তুলে না রাখলে পরে কল পাওয়া দুরূহ।

জল নারাণকে অন্য দিনও তুলতে হয়। নিস্তারিণী কাজ সেরে ফিরে আসবার আগেই কলের জল চলে যায়। আর নলিনী কলতলায় গেলেই চারিপাশের সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন তাকে গিলে ফেলতে আসে। সে তাই তাকে কলতলায় যেতে দেয় না পারদপক্ষে। এই বস্তি ছেড়ে কোন ভদ্রপাডায় চলে যাবার কথা সে কতদিন ধরে ভেবে আসছে। কিন্তু এতদিন সেটা সম্ভব হয়নি শুধু সে উপার্জ্জন অক্ষম বলেই। এবার সে নিশ্চয়ই এখান থেকে উঠে যাবে কোন ভদ্রপল্লীতে। এই জঘন্য জায়গায় মানুষে থাকে।

কথাগুলো ভাবতেও নারাণের ভগ্ন হৃদয় মহোল্লাসে দুলে উঠল। এতদিনকার বেকার জীবনের অবসান ঘটবে আজ সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। নতুন পৃথিবী, নতুন জীবন তার আগামীকালের ইতিহাস উজ্জ্বল ক'রে তুলবে। লেখাপড়া তেমন কিছু সে শিখতে পায়নি স্বল্পবুদ্ধিতাব জন্যে নয়, পয়সার অভাবে। সাংসারিক আবর্ত্তের মধ্যে পড়ে এদিকে দৃষ্টি ফেরাবার তার অবকাশ মেলেনি। বেঁচে থাকবার একটুখানি সংস্থান সে তন্ন তন্ন ক'রে চারিদিকে খুঁজে বেড়িয়েছে। এতদিন পরে সে সেই সুযোগ লাভ ক'রলে। সমস্ত ঝক্কি বইতে হবে এবার থেকে তাকে

একা। একথা ভাবতেও পুলকের মৃদু শিহরণ তার সারা দেহে ও মনে ছড়িয়ে পড়ল। সবচেয়ে বড় আনন্দ তার, মাকে এবার সে মুক্তি দিতে পারবে: পাঁচুকে সে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা ক'রতে সক্ষম হবে। এতদিনকার জীবনের ওপর তার যতখানি ধিক্কার এসেছিল ততখানি মমতা এল আজ। তার চলাফেরার মধ্যে ছিল না একটুও আনন্দ: নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছিল তার মন বয়সের সমবায়ে। জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ ক'রে সে এবার থেকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ ক'রে নিতে পারবে নিজের আয়ু। অসংলগ্ন চিন্তা তার মগজে ঘুরপাক খেতে লাগল। আজ থেকে আর কেউ তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে না। নির্দ্ধারিত পরিধির বেষ্টনী থেকে সে তফাতে যাবার অধিকার পাবে। কিন্তু এসব ভাবতেও তার ভাল লাগল না। আজ সারাদিন সে পাঁচুর কাছে যেতে পারবে না, সেই ব্যথা তাকে আঘাত দিতে লাগল। মনকে সে কিছুতেই বেঁধে রেখে দিতে পারলে না। সটাং সে এগিয়ে গেল।

নলিনী তখন ঘরে ছিল না।

পাঁচুর মাথার গোড়ায় বসে নারাণ বললে, আজ থেকে কাজে ঢুকলুম পাঁচুদা।

পাঁচুর বিবর্ণ মুখখানা আনন্দে ভরে উঠল। তার হাতখানা চেপে ধরে সে বললে, মাইনে পেলে খাইয়ে দিবি তো?

—দোব না? আমার আর আছে কে পাঁচুদা তোমরা ছাড়া! আচ্ছা পাঁচুদা, তুমিও না এক ছাপাখানায় কাজ ক'রতে?

—হ্যাঁ। কম্পোজ ক'রতুম। সে ছাপাখানা যদি টিঁকে থাকত, এতদিনে ৪০৲ টাকা মাইনে হ'ত।

নারাণ চমকে উঠল। একদিন তাহ'লে তারও ৪০৲ টাকা হ'তে পারে ভেবে।

নলিনী সুখদার উনানে বার্লি ক'রতে গিয়েছিল। ফিরে এসে নারাণকে দেখে বললে, আটটা বেজে গেছে, সে খেয়াল আছে।

নারাণ ঘাড় নাড়লে।

—দশটায় তো পৌঁছুতে হবে। এখন না গেলে কখনই বা নাইবে আর কখনই বা খাবে শুনি? তুমি যাও ভাই, এখন তো ও ভালই রয়েছে।

নলিনীর তাড়ায় নারাণকে উঠতে হ'ল। নিস্তারিণী রাত থাকতে উঠে ছেলের জন্যে ভাত রেঁধে কাজে বেরিয়ে গেছে। সে হেঁসেলে গিয়ে নিজেই বেড়ে নিলে, নিজেই আবার নিকিয়ে রাখলে। খাবার পরে সে আর এক মিনিটও বাড়ীতে রইল না। তাড়াতাড়ি শার্টটা গলার মধ্যে ঢুকিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

সমস্ত রাস্তার তুচ্ছ যা কিছু সবই আজ নতুন রূপে নারাণের চোখের সামনে ধরা পড়ল। যে সব জিনিষ তার মনে হ'ত কুৎসিৎ, জঘন্য—যারা এতদিন তার মনে একটুও রঙ্ ফলাতে পারেনি, তারাই আজ অপূর্ব্ব শ্রীতে বিমোহিত ক'রে দিতে চায়। অন্তরের রিক্ততাকে আজ সে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত অন্ধকারকে আলোর উৎসে স্নান করিয়ে নিয়ে সে বেকার জীবনের অবসান ঘটাবে। আজ তার কোন গ্লানি নেই : সংস্থানের সহায় আজ তাকে বাঁচবার অধিকারী ক'রে তুলবে।

নারাণ জোরে পা চালিয়ে দিলে।...

প্রেসের মধ্যে ঢুকতেই লালবিহারী তাকে সাদরে মেশিন ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। সে ভেতরটা দেখে দস্তুরমত ভড়কে গেল। সভয়ে বললে, এ সবের আমি তো কিছুই জানি না লালবেহারীদা।

—একদিনে কি কেউ জানতে পারে? দেখনা আমরা কি ভাবে কাজ করি। দেখতে দেখতে তুই-ও একদিন পাকা হ'য়ে উঠবি। সেদিন আর এই বুড় লালবেহারীদাকে তোর মনে থাকবে না।

—না লালবেহারীদা, তোমার ঋণ আমি কোনদিন শোধ ক'রতে পারব না।

—নে, জামা ছাড়্—গেঞ্জি আছে তো?

নারাণ ইতস্ততঃ ক'রছিল।

—না-ই বা রইল? বাবুয়ানির এ কাজ নয়। এ কুলির কাজ।

নারাণ মুহূর্ত্তের মধ্যে জামা খুলে ফেললে।

—ঐ যে পেরেক টাঙান রয়েছে, ঐখানে ঝুলিয়ে রাখ।

লালবিহারী মেসিনের সুইচ টেনে দিলে।

—বেশ মন দিয়ে দেখ, কি ভাবে আমি ক'রছি। এইটা হচ্ছে ব্রেক, এইটে দিয়ে স্পীড্ মাপা যায়, ওটাকে বলে সুইচ, ঘুরিয়ে দিলেই চলবে।

নারাণ একাগ্রতা দিয়ে দেখে যেতে লাগল। তার চোখে এসব বিস্ময় নয়, রহস্য।

যতদিন না নারাণ মেসিন চালাতে পারদর্শিতা লাভ ক'রছে, ১০৲ টাকা ক'রে পাবে। তারপর আরো ৫৲ টাকা দেওয়া হবে অবশ্য যদি সে ম্যানেজারকে কাজ দেখিয়ে খুসী ক'রতে সমর্থ হয়। একথা শুনে পর্য্যন্ত তার মন উৎফুল্লে ভরে আছে। সারাদিনের পরিশ্রম তাকে এতটুকু বিবশ ক'রতে পারে না। সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত তার এর-ওর ফাই ফরমাজ খাটতেও কম হয় না। তবু সে এসব কিছুই গায়ে মাখে না। ম্যানেজারের চোখে নিজেকে কৃতকর্ম্মা করবার উৎসাহ তাকে পেয়ে বসেছে। প্রথম সপ্তাহেই সে মেশিন চালাতে গিয়ে ডান হাতের দু'টো আঙুল একেবারে থেঁৎলে ফিরে এল। তারপরও, যখনই সে অবসর পেয়েছে নিজেকে সফলতায় ভরিয়ে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে এসেছে। নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন ক'রে

জগতের চোখে সে যতখানি ছোট হ'য়ে পড়েছিল এবার থেকে সে সব ফিরিয়ে পাবে। বাঁচবার দাবি তাকে বেঁচে থাকবার মধ্যে খুঁজে নিতে হবে মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা ক'রে বসল।

আগামীকালের সব চিন্তা নারাণের গুলিয়ে গেল ছুটির ঘণ্টা পড়তেই। আনন্দে শিষ দিতে দিতে সে রাস্তায় বেরুল। রাতের কোলকাতা সে রোজই দেখে,—বৈচিত্র্যহীন, গতানুগতিক। নগরীর অন্তরালবর্ত্তিনী সৌন্দর্য্যের আভাস সে আজ প্রথম সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি ক'রলে। জনতার স্রোত বয়ে চলেছে। সে-ও গা ভাসিয়ে দিলে।

বাড়ীতে জামা কাপড় ছেড়েই নারাণ পাঁচুর ঘরে ঢুকল।

নলিনী বললে, আচ্ছা নারাণ, তোমার কি আর অন্য কাজ নেই এখানে আসা ছাড়া! একটুখানি ফাঁক পেয়েছ কি অমি এসে জুটেছ। নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখেছ কোনদিন! সত্যি বলছি, এম্নি ক'রলে আর তোমায় আসতে দোব না।

—তুমি বড় হিংসুটে যাই বল বৌদি।

—হিংসুটে! কথাটা নলিনী মনে মনে উচ্চারণ ক'রে বললে, এই রোগীর ঘরে সারাক্ষণ বসে থাকলে নিজেরও তো শরীর খারাপ হ'তে পারে। তোমার ভালবাসা, তোমার দয়া তুমি না এলেও আমাদের চিরদিন মনে থাকবে।

—তুমি বসে থাক, তোমার বুঝি হবে না, জানতে পেরেছ।

—তা কেন? আমার যে উপায় নেই ভাই।

নারাণ চুপ ক'রে বসে রইল।

—লোকে ছুটি পেলে কত আনন্দ করে। তোমার কি কিছুই ইচ্ছে যায় না!

—তুমি হাসালে বৌদি। আনন্দকে খুঁজলে পাওয়া যায় না। ও হচ্ছে মনের জিনিষ। তুমি যাও এখন, ক'রাত জেগে জেগে

তোমার চোখ দু'টো করমচার মত লাল হ'য়ে উঠেছে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাওগে। কাল তো আমার ছুটি।

—তুমি কি যে বল!

—যা বলছি ভালই। আমার কথা শোন বৌদি। এখন তুমিও যদি রোগে পড়, কি হবে একবার ভেবে দেখেছ?

নলিনী আর দ্বিরুক্তি না ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাঁচু জেগেই ছিল। উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনে সে বললে, তোমাকেই শুধু ও ভয় করে নারাণ। আমি কতবার ওকে ঘুমবার কথা বলেছি, ও কাণও দেয় না। বলতে গেলেই বলে ঘুম আসে না। আচ্ছা নারাণ, আমি ভাল হ'য়ে উঠব তো?

—নিশ্চয় উঠবে পাঁচুদা। ভগবান কি এম্নিই হবেন।

এমন সময় নলিনী এল।

—মাসীমার যে ওদিকে হাঁক পেড়ে পেড়ে গলা চিরে যাবার যোগাড়। আর তুমি দিব্যি বসে রয়েছ। আচ্ছা ছেলে যা হোক তুমি? সাধে কি বকুনি খাও। যাও, শুনে এস—

নারাণ তখুনি অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

পাঁচু বললে, নারাণ বলেছে আমি বাঁচব নলিনী।

নলিনী একথার কোন জবাব দিতে পারলে না।

পাঁচু বললে, আর তো কিছুই নেই। তোমার হাতে রুলি দু'টো তাও তো গেছে শুনেছি। সেরে উঠেই বা খাব কি? এই শরীর নিয়ে তো আর কাজে বেরুতে পারব না।

—সে তোমায় ভাবতে হবে না। আমি মাসীমাকে বলে রেখেছি কোথাও কাজ দেখতে। মন্দ কি যদি তিন চার টাকা পাওয়া যায়। দু'বাড়ী ক'রলে যাহোক ক'রে চলে যাবেখন।

কথাটা শুনে পাঁচু চুপ ক'রে গেল।

স্বামীর অন্তরের ব্যথা বুঝতে পেরে নলিনী বললে, এর জন্যে অপমান কিছু নেই আমাদের। মাসীমা যখন ক'রতে পেরেছেন, আমিই বা পারব না কেন?

—না, সে কথা ভাবছি না নলিনী। আমাদের আবার মান অপমান। ভাবছি আমার জন্যে তোমায় আরো কত দুঃখু সইতে হবে।

—এতে আবার দুঃখু কি? বস্তিতে যারা বাস করে তাদের দুঃখু বলে কিছু নেই। ফগুয়ার ছেলে মলো, বৌ মলো একই দিনে কলেরায়। দুঃখু তার কি ক'রতে পারলে? সে তাড়ি খাওয়া ছেড়েছে? মাদল বাজান বন্ধ ক'রেছে? দুঃখু নেই এখানে। দুঃখু থাকলে সে অমন ভাবে নিজেকে ভুলতে পারত না। ওসব ছেড়ে দাও তুমি। বার্লি আনব?

—বার্লি? আন।

নলিনী তখুনি বার্লি নিয়ে এল। ঝিনুকে ক'রে অতি সন্তর্পনে খাইয়ে দেবার পর সে নিজের শাড়ীর একাংশ দিয়ে স্বামীর মুখ মুছিয়ে দিলে।

পাঁচু বললে, ও ঝিনুকটা খোকার ছিল না নলিনী?

—হ্যাঁ। উদাস স্বরে নলিনী উত্তর দিলে।

—ওটা দিয়ে তুমি আর কোনদিন আমাকে খাইও না। আমি খোকাকে ভুলে যেতে চাই। তার কোন জিনিষ আমার সাম্নে এন না। আমার ভারী কষ্ট হয়। বুকের ভেতরটা যেন কেমন ক'রে ওঠে।

—আচ্ছা, আর আনব না। আমার ভুল হ'য়ে গেছে।

পাঁচুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল একটা মাস একটানা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। নারাণ এই তিরিশটা দিনের মধ্যে নিজেকে যথেষ্ট উপযোগী ক'রে নিয়েছে। অবহেলার দান সে মাথায় পেতে নিতে পেরেছিল বলেই

আজ সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপত্তি তার কপালে জুটেছে। নইলে যে-নারাণ, সেই নারাণই থাকত।

আজ তাদের মাইনের দিন। সকাল থেকে সকলের মুখে একটা প্রফুল্লতার দীপ্তি। নারাণেরও। একে একে সবাই মাইনে আনতে গেল, ফিরে এল, সবাই সে দেখলে। অন্তর তার খুসীতে কানায় কানায় ভরে উঠল এই ভেবে যে সে-ও আজ মাইনে পাবে। মনের অস্থিরতাকে সে কিছুতেই দমন ক'রতে পারলে না হাজার কাজের মধ্যেও। তার অপ্রতিহত দৃষ্টি নিজের পরিচিত গণ্ডীর ভিতর থাকতে চাইল না। সমুদ্রের বিক্ষোভতা তাকে সচেতন ক'রে দিয়ে গেল। মন থেকে সে সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার মন বসালে কাজে। ম্যানেজারের কাছে নিজেকে মূল্যবান করবার প্রচেষ্টা তার প্রভূত। এখনো তাকে এতগুলো কাগজ ছাপতে হবে। কপালের ঘামটুকু মলিন একখণ্ড ন্যেকড়া দিয়ে মুছে সে পুনরায় কাজে মন দিলে।

লালবিহারী তার পাশে এসে দাঁড়াল।

—কেমন হ'চ্ছে লালবেহারীদা? নিজের অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট হ'য়ে নারাণ প্রশ্ন ক'রে বসল।

একখানা ছাপা কাগজ তুলে নিয়ে লালবিহারী পরীক্ষা ক'রে বললে, বেশ হ'চ্ছে। হাত পাকিয়ে ফেলেছিস দেখছি এরিমধ্যে। তারপর সেই কাগজখানা মুঠোর মধ্যে চেপে সে দূরে নিক্ষেপ ক'রলে।

নারাণ সাম্নের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

—এই বেলা গিয়ে মাইনেটা নিয়ে আয়। পরে অফিসের বাবুরা এসে পড়লে ভীড়ে আর নিতে পারবি না।

মেশিন বন্ধ ক'রে নারাণ কালিমাখা হাত পরিষ্কার ক'রতে গেল।

লালবিহারী বললে, চট্ ক'রে আসিস।

নারাণ তাড়াতাড়ি ফিরে এল।

—চ', আমার সঙ্গে চ'। এবারটা না হয় তোকে সঙ্গে ক'রেই নিয়ে যাই।

নারাণ জামা পরবার উদ্যোগ ক'রছিল।

লালবিহারী বাধা দিয়ে বললে, জামা পরবার আর দরকার নেই, চ' না এম্নিই—আমাদের কি আর কেউ ভদ্রলোক ভাবে!

লালবিহারীর পিছন পিছন নারাণ চলল।

ক্যাশিয়ার বাবুর সাম্নে গিয়ে লালবিহারী বললে, এর নাম নারাণ পাল। মেশিন ঘরে নতুন এ্যাপয়েন্ট হ'য়েছে স্যার্।

মোটা পে-বুকখানা নারাণের দিকে এগিয়ে দিয়ে ক্যাশিয়ারবাবু বললেন, এইখানটায় সই কর।

নারাণ সই ক'রলে। কিন্তু তার হাত কেঁপে উঠল।

জীবনের একটি পাতা নারাণের স্মরণীয় হ'য়ে রইল। নামের পাশে সে দেখতে পেলে লেখা রয়েছে কেবলমাত্র দশ টাকা। টেবিলের ওপর থেকে নোটখানা তুলে নিয়ে সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর সেখানা ভাঁজ ক'রতে ক'রতে সরে এল। নিজের পরিচিত স্থানটিতে গিয়ে সে অতি সাবধানে বুক পকেটে বন্দী ক'রে রাখলে তার উপস্থিত রত্নটিকে। এই কাগজখানাই তার জীবনের একমাসের মূল্য।

দ্বিগুণ উৎসাহে নারাণ আবার কাজে মন দিলে। সবগুলো না শেষ ক'রতে পারলে তার নিষ্কৃতি মিলবে না।...

ছুটির ঘণ্টা পড়ল।

সবাই আনন্দে দিশেহারা হ'য়ে বেরিয়ে পড়ল। নারাণও বেরুল। পথ চলার আনন্দ আজ তাকে মাতিয়ে তুললে। বার বার পকেটে হাত দিয়ে তার এই কথাই মনে হ'তে লাগল যে ওদের কাছে দশ টাকা হ'তে পারে সামান্য তার কাছে একটা রাজ্যের সামিল কিন্তু তার

চেয়েও অনেক বড়, অনেক দামী। সে মনে মনে হেসে উঠল। আজ আর তার অভাব নেই। জীবনের শীর্ণতা সে আজ সোণালী রঙে ছুপিয়ে নিতে পারবে। সে চলেছে তার পরিচিত পথ ধরে। মায়ের নিরানন্দ মূর্ত্তিখানি সে আজ ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণ ক'রে দেবে। টাকা—টাকা—টাকা—এর জন্যেই সে আজ বেকার নয়। তার জীবনের মূল্য আজ অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে শুধু সে উপার্জ্জন ক'রতে শিখেছে বলেই। চিন্তার হাত থেকে এবার সে রেহাই পাবে। বাড়ীওলার মৃদু তিরস্কার আর তাকে সইতে হবে না। অনির্দ্দিষ্টের মুখ চেয়ে তার দিন কাটাবার আর দরকার নেই। কৃতজ্ঞতায় সে তাঁর কাছে মাথা নোয়ালে, যাঁর প্রতি সে বিশ্বাস হারিয়েছিল একদিন।

বৌবাজারের মোড়ে আসতেই নারাণের সহসা মনে পড়ে গেল, সুকোমলবাবু কমলালেবুর রস খেতে বলেছেন পাঁচুদাকে। দিল্লীওলার ফলের দোকান সারি সারি তার নজরে পড়ল। সব চেয়ে বড় দু' জোড়া লেবু নিয়ে সে নোটখানা তার হাতে দিলে। আপেল, ডালিম, আঙুর—আরো কত কি সব সাজান রয়েছে। সেদিন পাঁচুদা আঙুর খেতে চেয়েছিল। সে কথাও তার মনে পড়ল। তখুনি সে দোকানীকে এক পোয়া আঙুর দেবার কথা জানালে।

দোকানদার প্রশ্ন ক'রলে, আওর কেয়া দেগা বাবুজি ?

হাত নেড়ে নারাণ নিষেধ ক'রলে, আর কিছু চাই না।

টাকাগুলো বাজাবার পর্য্যন্ত নারাণের সময় হ'ল না। আজ সে পাঁচুদার মুখে হাসি ফোটাবে। যাকে সে অকারণ চিন্তার হাত থেকে অতি সহজে নিষ্কৃতি দেবে।

বেশ ভাবছিল নারাণ। তার চিন্তার ধারা সহসা বাধা পেলে করুণ আর্ত্তনাদের স্পর্শ পেয়ে। ক্ষণেকের জন্যে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নলিনীর গলার স্বর তার সুপরিচিত। তবু তার মনে হ'ল,

তার দেহের দুর্ব্বলতা কি তার মনেও আসন বিছিয়েছে! সে কি ভুল শুনছে! কান পেতে সে গভীর মনোযোগ দিয়ে আবার শুনতে লাগল। সর্ব্বংসহা ঐ নারীটির অসহায় আর্ত্তরব তাকে বিবশ ক'রে দিলে। কত প্রযত্ন, কত উৎকণ্ঠা তার সাধনার ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি এতগুলো দিন। স্বামীর অক্ষয় জীবনের বিনিময়ে সে মুখ বুজিয়ে নিজেকে ক্ষয় ক'রতে দ্বিধা বোধ করেনি। শত অনুনয়ে, অসংখ্য অনুরোধে কেউ তাকে বিছানার পাশ থেকে ওঠাতে পারেনি। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, স্বামীকে বাঁচিয়ে তোলার কঠোর ব্রত নিয়ে সে দিনের পর দিন ব্যয়িত ক'রেছে। তবে কি সর্ব্বহারার গান গাইবার তার আজ দিন এসেছে! তাই কি সে কাঁদছে! আকুল আগ্রহে সে ঘরে ঢুকল।

নলিনী কাঁদছে। বন্যার স্রোত তার চোখে এসে নেমেছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধন হারিয়ে ফেলার ব্যথাই ওকে ক্রন্দসী ক'রে তুলেছে। কাঁদুক—আহা-হা, কাঁদুক ও; আর ওর কাঁদবার দিন আসবে না। মানুষের জীবন বলতে যদি একেই বোঝায়, বেঁচে থেকে মরণের আস্বাদ নারাণকে প্রতিনিয়ত পেতে হবে। অসম্ভব - তার পক্ষে বেঁচে থাকা একেবারে অসম্ভব। একটা মাসের আনন্দ তার মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। নীরবে সে ফলের ঠোঙাটি হাতে নিয়ে পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় স্তব্ধ হ'য়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

জীবন অনাবশ্যক

যারা স্বর্গে এবং যারা নরকে, তাদের কথা স্বতন্ত্র: তারা ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র। ঈশ্বর তাদের রক্ষা ক'রেছেন।

কিন্তু যারা আজো বেঁচে রইল, স্বর্গেও যেতে পেলে না, নরকে যাবার অনুমতির অপেক্ষায় এখনো মাটির পৃথিবীকে দুই পায়ে মাড়িয়ে রয়েছে—তারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা ভাবে না। ভাবে নিজেদের এই সুখ দুঃখময় জীবন কেমন ক'রে পরিপূর্ণ উপভোগ করা যায়। জীবনই তো সত্য, তাই তারা নিজেকে বিশ্বাস করে ঈশ্বরের চেয়েও বেশী।

অলকাও একদিন তাই ক'রে বসল।

. নিজেকে ঈশ্বরের চেয়ে শক্তিশালী মনে ভেবে মুরারীকে নিজের সংসারে নিয়ে এল।

এই মুরারীকে তিন মাসের রেখে মা যেদিন মারা গেল, সেইদিন থেকে তা'র সমস্ত দায়িত্ব অলকা নির্ব্বিবাদে নিজের মাথায় পেতে নিলে। তখন তা'র বয়েস কতই বা? এগারও বোধ হয় পেরোয়নি। তখন থেকেই ঐ একরত্তির মেয়ে ক্রমাগত চেষ্টা ক'রে এসেছে ছোট ভাইটিকে মায়ের অভাব একদিনের জন্যেও টের পেতে দেবে না। ভাই কেমন জিনিষ এগার বছরের মেয়ের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়, তবু ছোট ভাইটিকে কেন্দ্র ক'রেই সে আশা-আকাঙ্ক্ষার সৌধ

নির্ম্মাণ ক'রেছিল। কল্যাণী যখন তার ভাইকে নিয়ে খেলা ক'রত; পুতুলের বিয়ে উপলক্ষে নিজের হাতে রেঁধে তাকে খাওয়াত, তখন তার মনে হ'ত যদি তারও একটা ভাই থাকত—সে-ও অম্নি ক'রে পুতুলের বিয়ে দিত, অম্নি ক'রে ইট সাজিয়ে নতুন খেলাঘর তৈরী ক'রতে পারত। একথা সে বিস্তীর্ণ মাঠের প্রান্ত সীমায় একা দাঁড়িয়ে কতদিন বলেছে আর নীলাকাশের পানে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে। তার সকরুণ আহ্বান বিফল হয়নি। মুরারীকে সে পেয়েছে। পেয়েছে ব'লেই আজ দুর্দ্দমনীয় একাগ্রতা সে সংগ্রহ ক'রতে পেরেছে। নইলে মায়ের অভাব তাকে নিয়তই পীড়া দিত। অন্তরের গুমরে-ওঠা হাহাকার গোপনে বিপুল জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি ক'রে তার সাধনাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত। তাই অন্ধ স্নেহের পরিবর্ত্তে জীবনের সকল সঞ্চয় শূন্য ক'রে ফেলতেও তার দ্বিধা নেই। মুরারী ট্রেন দেখলে হাসে, সে দিনের মধ্যে অমন কতবার তাকে ট্রেন দেখিয়ে আনে। গোরুর গাড়ীতে চাপিয়ে দিলে তা'র হাসি ধরে না—নাগুন গাড়ীর পিছনে তাকে বসিয়ে দিয়ে পিছু পিছু ইটখোলা পর্য্যন্ত দৌড়ে যাওয়া চাই। এতে তা'র বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই—অবসন্নতার একটা সুস্পষ্ট রেখাও তার মুখে ফুটে ওঠে না। ভাইটিকে খুসী করবার স্পৃহা এম্নি ক'রেই তার সকল কাজে বিঘ্ন ঘটায়। তার চুল বাঁধা হয় না, পড়া এগোয় না, খাবার অবসর মেলে না। নিজের সুখ-সুবিধা সে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে না। এর জন্যে পিসিমার কত ভর্ৎসনা তাকে শুনতে হ'য়েছে। বাবার কত ধমকানি সে নীরবে সহ্য ক'রেছে। তবুও এক মিনিটের জন্যে সে ভাইটিকে কোনদিন দৃষ্টির আড়াল হ'তে দেয়নি। সে তার জীবনে এনে দিয়েছে নব কল্পনার পরিদৃশ্যমান সফলতা। তার মধ্যেই সে খুঁজে পেয়েছে প্রশস্ত জীবনের নতুন আলো।

অলকা ভেবেছে, এই আলোই একদিন তার জীবনে বিচিত্র বর্ণে সুরঞ্জিত হ'য়ে রামধনুর সৃষ্টি ক'রবে। তাই তার অন্তহীন অধ্যবসায়।

এত পারেও অলকা। মুরারীকে চব্বিশ ঘণ্টা পাড়াময় বয়ে বেড়াতে তার একটুও ব্যাজার নেই।

সার্কাসের তাঁবু পড়েছে রথতলার মাঠে। মুরারীকে বাঘ দেখিয়ে আনতে গেছে অলকা।

সন্ধ্যে উতরে গেল। এখনো ফেরবার নাম নেই। বাঘের পেটে গেলেই পিসিমা বাঁচেন। এত ভাবনা তিনি ভাবতে পারেন না। একে বয়সের ভারে তিনি নুয়ে পড়েছেন তার ওপর আজ একাদশী। সারাদিনটা তাঁকে নির্জ্জলা উপোষ ক'রে থাকতে হ'য়েছে। মেজাজও তাই তাঁর রুক্ষ। আজ এলে হয়। তাকে দস্তুরমতো শাসন ক'রবেন তিনি। যত ভাবেন গায়ে হাত তুলবেন না, বজ্জাতি তার ততই বেড়ে চলেছে। একথা তিনি ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলেছেন কিন্তু তার সহায়হীন ভীরু চোখ দু'টির সাম্নে দাঁড়িয়ে তাঁর সমস্ত রাগ জল হ'যে গিয়েছে। আহা-হা, ওর মা নেই। করুণায় আর্দ্র হ'যে তিনি নিজেই চোখের জল মুছেছেন। প্রতিবারই শাসন করবার আগে স্নেহের শাসন সুরু হ'য়ে গিয়েছে।

আজ প্রথম সে-নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ল।

অলকা আসতেই পিসিমা তার গালে ঠাস্ ক'রে চড় বসিয়ে দিয়ে খিঁচিয়ে উঠলেন, একটুও কি স্বস্তিতে থাকতে দিবি না? কখন বেরিয়েছিস বাড়ী থেকে সে খেয়াল আছে? আজ আসুক অক্ষয়, তোর ভীরকুটি ভাঙছি।

—মুরো যে কাঁদছিল? আমি কি ক'রব?

—কি ক'রবি তা বাবা এলেই বুঝতে পারবি। কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়ে যেতে বলেছিল? তোর জ্বালায় আমার মরণ হ'লেই বাঁচি।

—আর কোনদিন যাব না পিসিমা। অলকার চোখ দু'টো করুণ হ'য়ে উঠল।

—ফের যদি আমাকে জিজ্ঞেস না ক'রে কোথাও বেরুস, তোর পিঠের ছাল আর আস্ত রাখব না।

—না পিসিমা কোথাও বেরুব না।

পিসিমা নিরস্ত হ'লেন। মুরারীকে নিজের কোলে টেনে নিয়ে বললেন, আমি ততক্ষণ ভাত বাড়িগে, হাত-মুখ ধুয়ে শীগগির আসবি। ব'লে তিনি রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

এই খাওয়া নিয়ে পিসিমাকে কম ভুগতে হ'য়েছে। মেয়ে রোজই বায়না ধরবে বাবা এলে একসঙ্গে খাবে। সারাদিন টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়ালে আটটা পর্য্যন্ত জেগে থাকতে পারবে কেন? অর্দ্ধেক দিন তো না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। তাই ভুলিয়ে সন্ধ্যে বেলায় ওকে না খাইয়ে দিতে পারলে তিনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। ও না খেয়ে রইল। সারারাত তিনিও কি ঘুমতে পারেন!

অলকা মোটেই দেরী ক'রলে না।

পিসিমা ভাত বেড়ে দিয়ে বললেন, খেয়েই যে ভাইটিকে নিয়ে বিছানায় ঢুকবি—তা হবে না! আজ পড়া দিয়ে তবে শুবি।

—ঘুম পেলেও শুতে যাব না পিসিমা?

অলকার নিরূপায় অবস্থার কথা স্মরণ ক'রে পিসিমা ব্যথিত হ'লেন। ওর ব্যথাতুর চোখ দু'টির পানে তাকিয়ে তাঁর চোখও ভারী হ'য়ে উঠল। আহা-হা, ওর মা যদি আজ বেঁচে থাকত, সামান্য এই কথাটা জানবার জন্যে অনুমতির অপেক্ষায় এম্নি ক'রে ওকে চেয়ে থাকতে হ'ত না। ও-ও কি সকলের কম আদরের?

পিসিমার হৃদয়ের সবখানি জুড়ে অলকার স্থান। অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর উৎপাতে মুখে তিনি যতই মৃত্যু কামনা করুন না কেন, বাঁচবার সাধ

তাঁর প্রবল। তিনি শুধু এইটুকু ভেবে দুঃখ্ পান, তাঁর অবর্ত্তমানে অলকাকে মানুষ ক'রবে কে? কে তাকে সংসারের সন্ধান দেবে? যে-দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা এতদিন তাঁকে বাঁচবার অফুরন্ত উৎসাহ জুগিয়ে এসেছে সেই অন্তরতম বাসনার সাফল্য না দেখে মরেও যে শান্তি পাবেন না, একথা বিশেষ ক'রেই জানেন। জানেন ব'লেই তিনি চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। বললেন, এখুনি তো আর ঘুম পায়নি! আর কিছু না ব'লে তিনি মুরারীকে কোলে শুইয়ে দুধ খাইয়ে দিতে লাগলেন।

অলকা যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলে। সে জানে, এখন পড়তে না বসলে কালকে পিসিমা কিছুতেই তাকে সার্কাসের ওখানে যেতে দেবে না। আজ তার যেতে দেরী হ'য়ে গিয়েছিল ব'লে সে একটা খাঁচাও দেখতে পায়নি। কল্যাণী, বকুল—ওরা সবাই দেখেছে। ডাক শুনেছে। মুরারীকে না দেখাতে পারার জন্যে তার অনুতাপের অন্ত ছিল না। তাই আজ আর সে পুতুল নিয়ে বসলে না বা মুরারীকে পাশে শুইয়ে সেই নাপিতের গল্প আরম্ভ ক'রলে না।

পিসীমা রান্নাঘর থেকে অলকার পড়া শুনতে পেলেন। হাতের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে তিনি বারান্দায় এসে বসলেন। নিতাইয়ের মার আসবার সময় হ'য়ে এসেছে।

নিতাইয়ের মার প্রত্যহ এই সময়টিতে একবার ক'রে আসা চাই। পাড়ায় লোকের অভাব নেই; তবু এই একটি মানুষের সঙ্গে দু'দণ্ড সুখ দুঃখের কথা কইতে না পারলে তাঁর যেন দিন কাটে না।

বারান্দায় ঢুকেই নিতাইয়ের মা বলে উঠলেন, আজ আমাদের অলকাদিদি এত লক্ষ্মী হ'য়েছে কেন বলত' দিদি?

—ওর কথা আর বলনা? হাড় কালি ক'রে দিলে।

নিতাইয়ের মা পাশে এসে বসলেন।

—সংসার আর ভাল লাগে না নিতাইয়ের মা। এই মেয়ের জ্বালায় জ্বালাতন। বাঁচতে আর একতিলও ইচ্ছে করে না। কি সুখে বাঁচব নিতায়ের মা ?

—সুখ আর কোন সংসারে আছে দিদি ? সহানুভূতি জানিয়ে নিতাইয়ের মা বললেন, নাতির মুখ দেখে মরবে না ?

—নাতির মুখ দেখবার আর সাধ নেই নিতাইয়ের মা। খুব হ'য়েছে ! এখন তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন এদের সকলকে রেখে ড্যাং ড্যাং ক'রে চলে যেতে পারি।

—সে কি দিদি ? এইবার অলকাদিদির একটা বিয়ে দাও। তুমি না থাকলে বিয়েতে আনন্দ ক'রবে কে ?

—ও মেয়ের বিয়ে দিতেও ভয় হয় নিতাইয়ের মা। মেয়ে কি সেই জুতের ? পরের বাড়ী গিয়ে নিজেও শান্তি পাবে না, আমাদেরও জ্বালিয়ে মারবে ? একটা কথা যদি শোনে ? যেটি বারণ ক'রব, সেটি আগে ক'রে বসে আছে। পই পই ক'রে বারণ ক'রলুম রথতলার মাঠে কচি ছেলেকে নিয়ে যাসনি। হিম পড়ছে অসুখ বিসুখ ক'রতে পারে। মেয়ে কি আমার কথা গেরাহ্যির মধ্যে আনে ? ছেলেটাও হ'য়েছে তেম্নি। বেড়াতে পেলে ক্ষিদে তেষ্টা ভুলে যায়। এই বয়সে এত ঝঞ্ঝাট কি আর পোষায়, তুমিই ব'ল না নিতাইয়ের মা, বিয়ে যে দোব শ্বশুরবাড়ী গিয়েও তো এইরকম জ্বালিয়ে মারবে। পরে এত কেন সহ্য ক'রতে যাবে ? সেখানে তো আর পিসীমাকে পাবে না যে মুখ বুজিয়ে সব সয়ে যাবে।

—সংসারের চাপ পড়লে সব শুধরে যাবে দিদি ? তখন দেখবে কাজের জন্যে ওকে আরো সময় খুঁজতে হবে।

—ওর কাজের কথা আর ব'ল না নিতাইয়ের মা ! কাজের মধ্যে তো কেবল দেখি যখন তখন মুরোর জামা-পেণ্টুলুনে সাবান ঘসা আর

যেখানে সেখানে ওকে নিয়ে ঘুরে বেড়ান। বয়েস বাড়ছে সে দিকে কি খেয়াল আছে? মেয়ে যেন ধরাকে সরা দেখেছে। তবু যদি একটাও ভাল কথা শুনতে পায়। কত বলি, একটু একটু ক'রে সংসারের কাজ-কর্ম্ম ক'রতে শেখ, এখন থেকে মুরোকে অত আস্কারা দিসনি। ভুগতে হ'বে নিজেকেই। মেয়ের কি এসব কথা কাণে ঢোকে। মুরো আর মুরো। তুমি দেখে নিও নিতাইয়ের মা, এই মুরোই ওকে জ্বালিয়ে মারবে।

মুরারী ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে হাঁটুর দোলানিতে। পিসীমা তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ফিরে এলেন।

—তুমি অলকাদিদির জন্যে কিছু ভেব না দিদি। তুমি দেখে নিও ও মেয়ে খুব কাজের হবে।

—ছাই হবে। এখনই তো কাজ করবার বয়েস। এখন যদি কাজকে ভয় করে আর কবে ক'রবে শুনি? আমাদের অন্নপূর্ণা ওর চেয়ে কতই বা বড়! তাকে দেখলে প্রাণ জুড়োয়। ঝি নেই, চাকর নেই অত বড় একটা সংসার একা চালাচ্ছে তো! ও সব মেয়েকে আদর ক'রতে ইচ্ছে যায় কি না বল তো নিতাইয়ের মা?

নিতাইয়ের মা উত্তর দেবার ফুরসৎ পেলেন না। বারান্দার বাইরে অক্ষয়বাবুর জুতোর শব্দ স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। তিনি ক্ষণ বিলম্ব না ক'রে তৎক্ষণাৎ লম্বা ঘোমটা টেনে এক প্রান্তে সরে গেলেন। অক্ষয়বাবু সুবাদে তাঁর ভাসুর হন।

আটটা বেজে গেছে। নিতাইয়েরও কল থেকে ফেরবার সময় হ'য়ে এসেছে। আর বসলে নিতাইয়েব মা'র চলবে না। একথা নিশ্চিৎ জানেন বলেই পিসিমা সতর্ক ক'রে দিলেন, যেও না যেন নিতাইয়ের মা, আমি পান নিয়ে যাচ্ছি।

নিতাইয়ের মা তেম্নি জড়সড় হ'য়ে দেওয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ঘরের ভেতর থেকে পিসীমার গলার স্বর পাওয়া গেল, তুমি আস নিতাইয়ের মা এতে কত আনন্দ হয়।

আনন্দ কি নিতাইয়ের মারও হয় না! এত আনন্দ হয় যে রোজই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে এরিমধ্যে এতখানি সময় কি ক'রে কেটে গেল? মুখে পান পুরে তিনি ফিস ফিস ক'রে বললেন, আসি দিদি।

—আবার কাল এস।

ঘাড় নেড়ে নিতাইয়ের মা চলে গেলেন।

অক্ষয়বাবু অফিসের পোষাক ছেড়ে প্রথমেই মেয়ের কাছে ছুটে এলেন। সকালে তাঁর মোটেই আদর করবার সময় থাকে না। রাত্রে ফিরে এসে বেশীর ভাগ দিন তিনি অলকাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেন। তাই যেদিন তিনি মেয়েকে জেগে থাকতে দেখেন খুসীতে তাঁর অন্তর আপনা হ'তেই ভরে যায়। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির কথা তাঁর মনে থাকে না। মাতৃহারা মেয়েটির ছোট্ট হৃদয়খানি পিতৃ-স্নেহের পরিচয়ে উদ্দীপ্ত ক'রে দেবার প্রবল ঝোঁক তাঁকে পেয়ে বসে। শত চেষ্টাতেও তিনি অন্তরের আলোড়ন ভেঙ্গে ফেলতে পারেন না। অলকা তখনো পড়ছিল। তিনি মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, তোমাকে আর পড়তে হ'বে না অলকা, এইবার তোমার ছুটি।

অলকা এতক্ষণ শুধু এই একটিমাত্র কথারই অপেক্ষা ক'রছিল। সঙ্গে সঙ্গে বই বন্ধ ক'রে ঘরে ঢুকে পড়ল।

—মুরো ঘুমিয়েছে ওকে আর ডেকে তুল না। তুমি আমার কাছে এস।

মুরারীর সর্ব্বাঙ্গে কাঁথাটি পরিপাটিরূপে চাপা দিয়ে অলকা বাবার কাছে ফিরে এল।

—আজ এত লক্ষী হ'য়েছ কেন বল তো অলকা? পিসীমার কাছে বুঝি বকুনি খেয়েছ?

—পিসীমা বকে না কি আমায়? তুমি তো ভারী জান?

অক্ষয়বাবু নিজেই খানিকটা হাসলেন। তারপর বললেন, দুষ্টু মেয়ে কোথাকার, পিসীমাকে এই ব'লে খোসামোদ করা হ'চ্ছে বুঝি?

মুখ বাঁকিয়ে অলকা বললে, তোমার চেয়েও পিসীমা আমাকে বেশী ভালবাসে। আমায় কত বড় পুতুল কিনে দিয়েছে।

—পিসীমাকে যেন কোনদিন জ্বালাতন ক'র না। জান তো, পিসীমা আমার চেয়েও বড়। তাঁকে জ্বালাতন ক'রলে ভগবান রাগ ক'রবেন।

—আচ্ছা বাবা, ভগবান পিসীমার চেয়েও বড়!

—হুঁ। অনেক বড।

—বুঝতে পেরেছি, ভগবান তাই আকাশে থাকে।

অক্ষয়বাবু মেয়ের মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে প্রশ্ন ক'রলেন, ভগবান আকাশে থাকে, একথা তুমি কি ক'রে জানতে পারলে?

—হুঁ, আমি জানি। পিসীমা বলেছে।

পিসীমাকে বলতে শোনা গেল, অক্ষয় রান্নাঘরে আয় বাপু, আজ আর ওখানে নিয়ে যেতে পারি না। শরীব আর বইছে না।

অক্ষয়বাবু জানেন, আজ একাদশী। তবু তিনি বিশেষ ব্যস্ত হ'লেন না: তেম্নি নির্ব্বিকার চিত্তে বসে রইলেন। মেয়ের এই অসংলগ্ন প্রশ্ন শোনবার জন্যে তাঁর অন্তর উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছে এতদূর যে, তিনি পুনরায় প্রশ্ন ক'রলেন, পিসিমা বুঝি বলেছে তোমায়?

—জান বাবা, পিসিমা বলেছে সেখানে আমার মা আছে।

—ওঃ! একটা অস্ফুট স্বর বেরুল অক্ষয়বাবুর গলা থেকে।

বাপের একেবারে পাশে ঘেঁসে এসে অলকা জিজ্ঞেস ক'রলে, হ্যাঁ বাবা, ভগবানের ভাই আছে?

অক্ষয়বাবু নীরব হ'য়ে রইলেন। মেয়ের এ অনাবশ্যক প্রশ্নের কি জবাব তিনি দেবেন বুঝতে পারলেন না। মাছ লেবেনচুসের মোড়ক তার হাতে দিয়ে তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা ক'রলেন। কিন্তু অলকাকে ভোলাতে পারলেন না।

একটি মাছ চুষতে চুষতে অলকা অভিযোগ ক'রলে, বল না বাবা ?

—আমি কি ভগবানকে দেখেছি যে বলব ? তুমি বরং পিসিমাকে জিজ্ঞেস ক'র।

অক্ষয়বাবু আর দাঁড়ালেন না।

অলকা মুরারীর পাশে গিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর মোড়ক কুলুঙ্গিতে রেখে উঠানে নেমে পড়ল। উজ্জ্বল আলোকিত রাত। মাথার ওপর স্বর্গের চাঁদ। অলকা সুদূর প্রসারিত দৃষ্টি তুলে স্বর্গের পানে তাকিয়ে রইল। পিসিমার মুখে সে শুনেছে, ওই চাঁদের দেশে তার মা আছে।...অক্ষয়বাবু মেয়েকে মুখ উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস ক'রলেন, অমন ক'রে কি দেখছ অলকা ?

—মাকে। আচ্ছা বাবা, আমার মা কোনখানটায় আছে ?

—তোমার মা—অক্ষয়বাবু কথাটি শেষ ক'রতে পারলেন না।

—মা ভারী দুষ্টু বাবা। আমাকে একদিনো দেখা দেয় না।

—না দিকগে, চল আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প করিগে। তোমাকে আজ এক মস্ত রাজপুত্তুরের গল্প বলব।

এত আলোকের মাঝেও অক্ষয়বাবুর মনে হ'ল কে যেন তাদের সাড়া পেয়ে ঘর থেকে এইমাত্র বেরিয়ে গেল।

ক্ষুদ্র জীবনের বৃহৎ অবলম্বনটিকে নাড়াচাড়া ক'রে অলকা পনেরয় পৌঁছুল।

পিসিমার যেটুকু স্বস্তি ছিল, তা-ও ঘুচল। বেঁচেও শান্তি নেই,

মরেও সুখ নেই। কি ক'রে মেয়ে পার হ'বে সেই চিন্তাই তাঁর প্রবল হ'য়ে উঠল। এতটা তিনি ভাবতেন না যদি বুঝতে পারতেন এর হাত থেকে অতি সহজে তাঁর নিষ্কৃতি মিলবে। যে আশা এতদিন তাঁকে নিশ্চিন্ত ক'রে রেখেছিল, অক্ষয়বাবুর নিরুদ্বেগতা তাকেই সমূলে ধ্বংস ক'রে দিলে। মেয়ের বয়স দিন দিন বেড়ে চলেছে, সেদিকে তাঁর এতটুকু নজর নেই, একটুও ভাবনা নেই। এ বিষয়ে তিনি ভোলানাথের চেয়েও আপনভোলা। তাঁর এই ভাবগতিক দেখে পিসিমা তো ভেবেই সারা! কি যে তিনি ক'রবেন সব গুলিয়ে ফেলেন। নিজে অথর্ব্ব হ'য়ে পড়েছেন, তার ওপর সংসারের বিরাট দায়িত্ব। কোথাও চলে গিয়ে হাড় জুড়বেন, তার পথও বন্ধ। আষ্টে-পৃষ্টে তাঁকে বেঁধে রেখেছে এই সংসার, এই সংসারের বৃহৎ সমস্যা। এর হাত থেকে তাঁর বেঁচেও অব্যাহতি নেই, মরেও পরিত্রাণ নেই। তিনি ভেবেছিলেন অলকাকে কারুর হাতে সঁপে দিয়ে সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে আসবেন। মুরারীর জন্যে তিনি মোটেই ভাবেন না। সে মানুষ হ'য়ে উঠবে, বাপের দুঃখু ঘোচাবে, নতুন ক'রে সংসার প্রতিষ্ঠা ক'রবে। নাত-বৌ আসবে। আবার এই বাড়ীখানায় আনন্দের মেলা বসবে। স্বর্গের চাঁদ উঁকি দিয়ে যাবে। অলকা শ্বশুরবাড়ী থেকে আসবে: সঙ্গে তার ছেলেমেয়েরা আসবে। সেই দূরাগত আনন্দ মুখরিত দিনটির কথা স্মরণ ক'রে তিনি নিজেকে উদ্‌ব্যস্ত ক'রতে চান না। সুদূর অতীতের এক টুকরো আনন্দের ভাগ বসাবার লোভ তাঁর কোনদিনই হয়নি। এত বড় আশা করাও তাঁর পক্ষে বিড়ম্বনা। শুধু নিজের ঘাড় থেকে অলকার ভার লাঘব ক'রতেই তিনি চেয়েছিলেন। এই একটি মাত্র কামনার মধ্যে তাঁর সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি। একে জয়যুক্ত ক'রে তোলাই তাঁর জীবনের শেষ সঙ্কল্প: শ্রেষ্ঠ নিবেদন। তাই অক্ষয়বাবুকে কিছু না জানিয়ে

গোপনে পঞ্চানন জ্যোতিশাস্ত্রীকে দিয়ে তিনি অলকার জন্মপত্রিকা গুণিয়ে নিয়েছেন। জ্যোতিশাস্ত্রী মশাই গুণে বলেছেন, এই বছরে বিয়ে হ'বার সম্ভাবনা। কথাটা যেদিন থেকে তিনি জানতে পেরেছেন, সেদিন থেকে তাঁর চোখে আর ঘুম নেই। অক্ষয়বাবু এই বিয়ের ব্যাপারে যত নির্লিপ্ত থাকতে চেয়েছেন, তিনি তত উতলা হ'য়ে উঠেছেন। কোন কথা বলবার আগে অক্ষয়বাবু বলে বসেন, মেয়ের অমতে বিয়ে দেওয়াটাই কি আমাদের উচিৎ। মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে ব'লে ওর কি কিছুই দাবি করবার নেই। জোর ক'রে বিয়ে দিয়েই কি ওকে সুখী ক'রতে পারা যাবে। তার চেয়ে ও যতদিন এইখানে সুখে থাকতে পারে, থাকুক না কেন? আমাদের সে-সুখটুকু কেড়ে নেবার কি এমন দরকার পড়েছে?

পিসিমা বলে বলে হার মেনেছেন। তবুও কি তিনি বলতে ছাড়েন? বলাটা তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এতক্ষণ তিনি বলবার সুযোগটুকুরই অপেক্ষা ক'রছিলেন। অলকা ডাগর হ'য়েছে—তাকে শুনিয়ে কোনোরূপ আলাপ আলোচনা করা নিতান্ত অশোভন দেখায়। আড়ালে অক্ষয়বাবুকে পেয়ে তিনি বলতে আরম্ভ ক'রলেন, মেয়ে বিয়ে ক'রবে না বলেছে বলে একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়াটা কি তোর ভাল হ'চ্ছে? তুই না হয় মেয়ের মুখ চেয়ে চুপ ক'রে আছিস। কিন্তু লোকে শুনবে কেন? পাড়াতে তো আর কাণ পাতা যায় না। যে শোনে, সে-ই বলে, এ আবার কোনদেশী কথা! মেয়েব কথামত বাপকে চলতে হবে। আমার কথা শোন অক্ষয়, পাত্র খুঁজতে আরম্ভ ক'রে দে। ওকে রাজী করানর ভার আমার। তুই-ও যদি এম্নি নির্ব্বিকারে বসে থাকিস, পাত্র কি বাড়ী বয়ে আসবে। তুই-ই বল না, বিয়ে না দিয়েই বা উপায় কি? আজ না হয় আমি আছি। ওকে চোখে চোখে আগলে রাখতে পারছি। কিন্তু চিরদিন তো আর আমি থাকব না।

মেয়ে এদিকে পনেরয় পড়ল, সে খেয়াল তোর আছে! অন্য বাপ হ'লে এতদিনে নাওয়া খাওয়া ঘুচে যেত। পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, একটা পার ক'রে দিতে পারলে তুই-ও বাঁচিস আমারো রেহাই মেলে। যা বলছি, তোর ভালর জন্যেই বলছি অক্ষয়, মিছিমিছি আর সময় নষ্ট করিসনি। মেয়ে বড় হ'লে অশেষ ভুগতে হবে। তখন কাণা, খোঁড়া যার-তার হাতে ধরে দেবারও পথ পাবি না। এই বেলা দেখে শুনে ওর একটা থিত ক'রে দে বাপু। তবু দেখে যেতে পারলে শান্তিতে মরতে পারব। বয়েসও হ'ল—আর ক'দিনই বা বাঁচব। মরে গেলে তো আর দেখতে আসব না। তবু মেয়েটার জন্যে—

মেয়েটার জন্যে অক্ষয়বাবুর উদ্বেগের সীমা নেই। ওই মেয়েই তাঁর জীবনের সমস্ত শান্তি কেড়ে নিয়েছে। ও যখন লুকিয়ে এসে বলে, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি বাবা, আমার বিয়ে দিও না। বিয়ে তো কত মেয়ের হয় না। কত মেয়ে তো বিধবাও হয় বাবা। মনে কর, আমি তোমার বিধবা মেয়ে। তারপর অশ্রুপূর্ণ চোখ তুলে নিতান্ত অসহায়ের ন্যায় মতামতের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে, তখন তাঁর সাহস হয় না সেই চোখের ভাষাকে বোবা ক'রে দেবার। তাই বর্ষিয়সীর প্রাত্যহিক এই অভিযোগ তাঁর প্রাণে কোনরূপ আলোড়ন সৃষ্টি ক'রতে পারে না। কথাগুলো নির্ব্বিবাদে হজম ক'রে না নেওয়া ছাড়া তাঁর অন্য কোন উপায়ও থাকে না।

পিসিমা অন্তরের ব্যাকুলতার পরিচয় দিয়েই চললেন, আজ যদি বৌমাও থাকত, আমি-ই কি এত ভাবতুম! তুই-ই বল না অক্ষয়, এখন কি আমার এই সব ভাববার বয়েস! দু' দণ্ড ঠাকুর দেবতার নাম করা চুলোয় থাক, তোদের সংসারের ভাবনা ভাবতেই আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এর ওপর তোরা যদি এম্নি ক'রে আমাকে দগ্ধে মারবি, কি আশাতে বেঁচে থাকব বল?

এত কথার পর অক্ষয়বাবু নিশ্চুপ হ'য়ে বসে থাকতে পারলেন না। বললেন, অলকার বিয়ে দিতে আমারও কি ইচ্ছে যায় না দিদি? আমি কি জানি না যে তাকে বিদেয় ক'রে দিতে পারলে আমিও নিঃঝঞ্ঝাট হ'তে পারি। কিন্তু কি ক'রব বল? সে-ই যখন বিয়ে ক'রতে চাইছে না।

—তোর কোন কথা শুনতে চাই না অক্ষয়। তুই পাত্র খুঁজতে বেরুবি কি না বল! তুই কি শুধু নিজের জেদটাই দেখবি? আমি কি কেউ নই? মেয়ের কথাই তোর কাছে বড় হ'ল!

অলকা চায়ের কাপ নিয়ে হাজির হ'ল। পিসিমার সব কথা বলা শেষ হ'ল না। তার মুখের পানে তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাকিয়ে রইলেন।

অলকা চায়ের বাটি নামিয়ে দিয়ে এক মিনিটও সেখানে দাড়াল না। রান্নাঘরে মুরারীকে একা বসিয়ে রেখে এসেছে সে। উনান জ্বলছে। শেষে কি একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। যা ছেলে!

পিসিমা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। আর তাঁর বসে থাকা চলবে না। ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে তাঁর দৃষ্টিশক্তি। বেলাবেলি রান্না চুকিয়ে না নিলে অনেক হাঙ্গামা পোয়াতে হয় তাঁকে। অলকাকে তিনি পারদপক্ষে হেঁসেলের দিকে ঘেঁষতে দেন না। আস্ত বয়েস ওর পড়ে রয়েছে। এই সময় ও যদি না একটু জিরান পায় আর কবে পাবে? সংসারে একবার ঢুকলে বেরুন যায় না। একথা তিনি বিশেষ ক'রেই জানেন। জানেন বলেই এক হাতে সব কাজ শেষ করেন; ওর সাহায্যের উপর নির্ভর ক'রে বসে থাকেন না। ও যেন না ভবিষ্যতে কোনদিন বলতে পারে, মা ছিল না বলে পিসিমা তাকে অযত্ন ক'রেছে: তার ঘাড়ে সমস্ত সংসারের ভার চাপিয়ে দিয়েছে।

অক্ষয়বাবুর চিন্তায় বাধা পড়ল পিসিমার প্রশ্নে।

—হিন্দুর ঘরে এমন তো কখনো শুনিনি যে মেয়ে বিয়ে ক'রবে না বলে বাপও দিব্যি নিশ্চিন্দে থাকে। তুই কি ভেবে রেখেছিস বলতো অক্ষয়! আইবুড় মেয়ে ঘরে পুষে রাখলে লোকে খুব বাহবা দেবে। তোর কথা তুই-ই জানিস। এত ক'রেও তোর মন পেলুম না। অলকা বুঝি একা তোরই আদরের সামগ্রী। ওকে বিদেয় ক'রে দিলে শুধু কি তোরই কষ্ট হবে?

উত্তরের প্রত্যাশা না রেখে পিসিমা অন্তর্হিত হ'লেন।

মুরারী বায়না ধরেছে রেলগাড়ী দেখবে। অলকা তাকে বোঝাচ্ছিল যে দুষ্টু ছেলেরাই রেলগাড়ী দেখতে চায়। যারা তার মত লক্ষ্মী, তারা চুপটি ক'রে ঢেঁকির মাঠে বল খেলা দেখে।

পিসিমা বিরক্তিভরে বললেন, অক্ষয়কে না হয় বল বাপু একটু ঘুরিয়ে নিয়ে আসুক। ছেলে যেটি বলবে সেটি না হ'লে কি রক্ষে আছে?

অন্যদিন হ'লে পিসিমাও ভোলাবার চেষ্টা ক'রতেন। আজ তাঁর একেই দেরী হয়ে গেছে, তার ওপর এখন ছেলেকে নিয়ে পড়লে অনুকূলের বাড়ী যাওয়া আর হ'য়ে উঠবে না। তিনি রান্নাঘরে সেঁধুলেন।

অলকা বললে, দেখলে তো পিসিমা কত রাগ ক'রলে। ছিঃ, দুষ্টুমি ক'রতে নেই।

—চল না দিদি আমায় রেলগাড়ী দেখিয়ে আনবে!

—রেলগাড়ীতে ছেলেধরা আছে। তুমি গেলেই ধরে নিয়ে যাবে। তখন কাঁদলেও আর আমার কাছে আসতে দেবে না।

—আমি রেলগাড়ী দেখব দিদি।

অলকা তাকে কোলে তুলে নিলে। উস্ক চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিলে। কত আদর ক'রলে, কত রকমের ভয় দেখালে কিন্তু

মুরারীকে কোন কথাতেই ভোলাতে পারলে না। খেয়াল চেপেছে রেলগাড়ী দেখবে। না দেখা পর্য্যন্ত কিছুতেই এখান থেকে নড়বে না ; দিদিকেও ছাড়বে না।

অক্ষয়বাবু স্থাণুর ন্যায় বসেছিলেন। সামে চায়ের খালি কাপ পড়ে রয়েছে ; সেটা পর্য্যন্ত তিনি কুলুঙ্গিতে তুলে রাখেন নি। মনের শিথিলতা দেহে আধিপত্য বিস্তার ক'রছে। অভাবনীয় চিন্তার হাত থেকে পরিত্রাণের সোজা পথ তাঁকে আজ বিভোর ক'রে দিয়েছে। সন্ধান তিনি এতদিন পরে পেয়েছেন। আজ থেকেই তিনি পাত্র খুঁজতে আরম্ভ ক'রবেন। হরিহরবাবুর ছেলেটির কথা তাঁর স্মরণে এল। ছেলেটি ভারী নম্র ; ভারী শান্ত। হরিহরবাবুকে বলতে দোষ কি ? অলকা তো দেখতে খারাপ নয়। তাছাড়া অলকার গুণ আছে। সে সেবা ক'রতে জানে, ভালবাসতে জানে। হরিহরবাবু সজ্জন। তাঁর দয়ার কথা গ্রামের সবাই জানে। কথাটা না জানান পর্য্যন্ত তিনি স্থির হ'তে পারছেন না। এখুনি তিনি জানিয়ে আসবেন —এই মুহুর্ত্তে। অসমর্থ দেহ কোনমতে তিনি উঠান পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে এলেন

অলকা এগিয়ে এসে বললে, মুরোকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এস না বাবা ! কিছুতেই আমাকে ছাড়ছে না।

—চ'। দুষ্টু ছেলে কোথাকার ! দিনরাত কেবলই বায়না।

মুরারীকে কোলে তুলে নিয়ে অক্ষয়বাবু বেরিয়ে পড়লেন।

অলকা কালবিলম্ব না ক'রে রান্নাঘরে ঢুকল। ঢুকে দেখলে পিসিমা ইতিমধ্যে ভাত চাপিয়ে দিয়েছেন। কুটনা কোটা তাঁর শেষ হ'য়ে গেছে। অফুরন্ত আনন্দের পরিবর্ত্তে নিস্তেজ বিবর্ণতা তার মুখের চারিধারে ঘনিয়ে এল। মুরারীর অসম্ভব জেদ তার সকল সঙ্কল্প গুঁড় ক'রে দিয়েছে। এর জন্যে তার অনুপাতের অন্ত ছিল না। কেন সে

অকারণে ছোট ভাইটিকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা ক'রতে গিয়েছিল। একটা দিন যদি সে কাঁদতই; কি বা এসে যেত। বরং এখন থেকে কাঁদতে শিখলে ভবিষ্যতে কান্নার ভয় ভেঙ্গে যাবে। আজ সকালে সে কত সাধ্যসাধনা ক'রে পিসিমার অনুমতি পেয়েছিল, নিজের হাতে রাঁধবার। এম্নি অহেতুকভাবে সেই সুযোগ নষ্ট হওয়াতে তার কান্না আসছিল। চুপ ক'রে দরজার পাশে সে দাঁড়িয়ে রইল। না জানি, তার এই বিলম্বের জন্মে পিসিমার কত ভৎর্সনা তাকে শুনতে হবে।

পিসিমা প্রথমটা টের পাননি। কোনদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপও ছিল না। ভাতের হাঁড়ি গামলার ওপর কাৎ ক'রে দিয়ে তিনি উনানে কড়া চাপিয়ে দিলেন। মাছের ঝোলটা চড়িয়ে দিয়ে ঝাঁ ক'রে একবার অনুকূলের সঙ্গে দেখা ক'রে আসবেন। যদি একটু দেরী-ই হ'য়ে যায়, অলকা কি আর এটা নামিয়ে নিতে পারবে না? খুব পারবে। তিনি এই বয়সে সব ক'রতেন। ভারী তো কাজ? যা চঞ্চল মেয়ে, সেইজন্যেই তো কাজ ক'রতে দিতে তিনি ভয় পান। শেষে কি একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবে! দোষ হ'বে তো তখন তাঁরই।

অলকা অপরাধীর ন্যায় দাঁড়িয়েছিল। পিসিমাকে জিজ্ঞেস করবার মত সাহসও তার ছিল না। ভয়ে মন তার দুলছে।

পিসিমা খুঁটির মত তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? আজ না বলিছিলি রাঁধবি?

অলকা এইবার এগিয়ে গেল। প্রতিদিনই সে এম্নিধারা এগিয়ে আসে কিন্তু তার শিশুসুলভ মন পড়ে থাকে মুরারীর চারিপাশে তাই রান্নাঘরের অন্ধকারে বন্দী ক'রে রেখে দেবার পক্ষপাতীত্ব পিসিমার মধ্যে কোনদিনই দেখা দেয়নি। আহা-হা, ওর মা নেই। ও যদি মুরোকে নিয়ে কথাটা ভুলে থাকতে পারে, থাকুক। তাঁর তা'তে বাধা দেবার কোন অধিকার নেই। আজকেকার এই ব্যতিক্রমের জন্যে

তাঁরও কি কম অনুশোচনা হ'চ্ছিল? কিন্তু কি ক'রবেন তিনি। অনুকূলের সঙ্গে দেখা করবার সহজ কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি অলকার রাঁধবার প্রস্তাবে স্বীকৃত হ'য়েছিলেন। এই সময় না গেলে তাকে আর ধরতে পারা যাবে না।

পিসিমা দাঁড়িয়ে উঠলেন।

—খুব সাবধানে সব ক'রবি। তাড়াতাড়ি করবার কোন দরকার নেই। এটা নামিয়ে দুধটা ফুটিয়ে রাখবি। আমি ততক্ষণে এসে পড়ব।

অলকা পিঁড়ির ওপর বসল।

—মুরো যদি এখুনি ফিরে আসে, অক্ষয়কে বলবি ভুলিয়ে রাখতে। ওকে আমার আরো ভয়।

পিসিমা আর দাঁড়ালেন না।

পথে নিতাইয়ের মার বাড়ী। সেখানে গিয়ে গল্প-গুজবের মধ্যে খানিকটা সময় কাটাতেও পিসিমার ইদানীং আর ভাল লাগে না। ততক্ষণ অনুকূলকে তাড়া দিলে কাজের হবে। অনুকূল হাজার হোক, পরের ছেলে। না হয় ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে; তাব'লে নিজেরও তো চাড় থাকা দরকার। অক্ষয়কে বললেও কোনদিন আসবে না; তাই তিনিও বলেননি। মিথ্যে পাঁচ কাণে তুলে কোন ফল হবে না। আগে পাকাপাকি এক জায়গায় ঠিক হোক।

পিসিমা সোৎসাহে এগিয়ে চললেন। অনুকূলের ভরসাতে তিনি আবার বুকে বল পেয়েছেন। তাই সংসারের মাপা সময়ের মধ্যেও তাঁর রোজ একটিবার ক'রে যাওয়া চাই। কোনদিন তার দেখা পেয়েছেন; কোনদিন না পেয়েই ফিরে এসেছেন। তবু একটা দিন তিনি বাদ দেননি। তার কত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। লতিকার বর তো সে-ই জুটিয়ে দিয়েছে। আজ একটা পাত্রের সন্ধান আনবার তার কথা আছে। সারা দিনটা তাঁর কি ভাবে কেটেছে; তা

শুধু তিনিই জানেন। মানৎ ক'রতে তিনি আর কারুর কাছে বাকী রাখেন নি। একবার মেয়েটাকে পার ক'রে দিতে পারলে হয়! গঙ্গায় তিনি সাতটা ডুব দিয়ে আসবেন। সবাই মিলে যে এতখানি শত্রুতা ক'রবে তা কি ঘুণাক্ষরেও তিনি আগে জানতে পেরেছিলেন। জানতে পারলে বৌমার চলে যাওয়ার পর তিনি এত বড় দায়িত্ব নিজের মাথায় কিছুতেই নিতে চাইতেন না। কেনই বা নেবেন? সংসার তাঁকে আর চায় না। সংসারের প্রয়োজন তাঁরও ফুরিয়ে গেছে; কিসের জন্যেই বা তিনি চাইবেন? নিজের সন্তান বলতে ছিল একটা মেয়ে। সেও মরেছে স্বামীর এক বছর পরেই। এখন থাকবার মধ্যে এই ভাইটি আর তার অপগণ্ড দু'টি ছেলে-মেয়ে। এরা তিনজনে মিলে তাঁর শেষ বয়সের শান্তি কেড়ে নিয়েছে: তাঁকে জোর ক'রে সংসারে ঢুকিয়েছে।

অনুকূল ছেলেটি সত্যই পরপোকারী। পাত্রের সন্ধান শুধু আনেনি, মেয়ে দেখাবার দিন স্থির পর্য্যন্ত ক'রে এসেছে। যাতে এই ফাল্গুনে শুভকার্য্যটা সুসম্পন্ন হ'য়ে যায় সেই ভেবে। ওপক্ষ থেকে যথেষ্ট তাড়া না থাকলেও পিসিমার অন্তরের ব্যাকুলতা দিন দিন যে রকম প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছে তা'তে সে যদি কালই এই আয়োজনের ব্যবস্থা ক'রত, এ পক্ষের আপত্তির লেশমাত্র থাকত না। এ রকম কুটুম্ব পাওয়া বহু ভাগ্যের কথা। বনেদী বংশ, তাছাড়া ছেলেটি মনের-মতন। ম্যাট্রিকুলেশান পাশ ক'রেছে। বাপের অবস্থাও খুব অসচ্ছল নয়। তিনটি ভাই। এইটি মেজ। কোথাও চাকুরী না পেয়ে দেশেতেই দোকান খুলেছে। মন্দ কি? তিরিশ টাকা মাইনের চাকরীর চেয়ে ঢের ভাল। সংসারে [illegible] ঝামেলা নেই। মুরারী যে রকম ন্যাওটা হ'য়ে পড়েছে, তা'তে ও দিদিকে ছেড়ে থাকতে পারবে বলে বোধ হয় না। ও সঙ্গে গেলেও কেউ কিছু মনে ক'রবে না। বড় ভাইয়ের ছেলেপুলে নেই। ওকে পেলে বরং তারা বর্ত্তে যাবে।

কথাগুলো পিসিমাকে খুসী ক'রলে। মেয়ের ভাগ্যে থাকে, ঐখানেই হবে। ভেবে আর তিনি কি ক'রবেন। তবু যাবার সময় অনুকূলের দু'টি হাত ধরে তিনি বললেন, তোমায় বাবা বেশী কি আর বলব। ওর একটা ছিল্লে হ'লে মস্ত ভাবনা আমার যায়।

—শিরীষবাবু যখন কথা দিয়েছেন, তখন ভাবনার কিছু নেই পিসিমা।

পিসিমা প্রফুল্লচিত্তে বিদায় নিলেন।

পথে পিসিমা কিছুতেই নিজেকে শান্তনে রাখতে পারলেন না। নিতাইয়ের মাকে এই সুসংবাদটা না জানিয়ে তিনি যেন তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। অলকার জন্যে তাঁর উদ্বিগ্নের অভাব ছিল না, তবু তিনি নিতাইয়ের মার বাড়ীতে ঢুকলেন।

—কই গো নিতাইয়ের মা ; কোথা গেলে ?

নিতাইয়ের মা হেঁসেলে ছিলেন। গলার আওয়াজ শুনে তখুনি বেরিয়ে এলেন।

—নারায়ণপুরের চৌধুরীরা রোববারে আমাদের অলকাকে দেখতে আসবে। আমি বাপু একেলের রীতি নীতি কিছুই বুঝিনে। তোমরা পাঁচজনে না দাঁড়ালে এত সব ক'রবে কে ?

—তোমায় তো বলেছিলুম দিদি, বাপ হ'য়ে কি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে ? আহা-হা, আজ যদি ওর মা থাকত, কত আনন্দ-ই না ক'রত ?

—সবই কপাল নিতাইয়ের মা। নইলে সে-ই বা চলে যাবে কেন ? আর এই মেয়েকে নিয়ে আমাকেই বা এত ভুগতে হবে কেন ? ওর বিয়েটা হ'লে আমি বাঁ[illegible] শুধু ওর জন্যেই আমার হাত-পা বাঁধা। তা না হ'লে ভাবনা ছিল কি ? অক্ষয় যে সমস্ত মেয়ে ঘরে জিইয়ে রেখে কি ক'রে দিন কাটায় তা ভগবানই জানেন। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর নিতাইয়ের মা ও যেন সুখী হ'তে পারে। চললুম দিদি,

সন্ধ্যে হ'য়ে গেল এদিকে। বাড়ীতে ডাগর মেয়ে একা রয়েছে, অক্ষয়ের তো এসব কথা মনে থাকে না। তুমি একটু সকাল-সকাল যেও বাপু, যদি আবার রান্না-বান্নার যোগাড় ক'রতে হয়। একা কোনদিক সামলাব।

পিসিমা আর দাঁড়ালেন না।

সত্যিই অক্ষয়বাবু এখনো ফেরেননি।

পিসিমা আসতেই অলকা জানালে, বড্ড ভয় ক'রছিল পিসিমা।

—ভয় কিসের? ওপাশে তোর মণিদি রয়েছে, এপাশে চরণদা।

—আছে বলে বুঝি ভয় করে না!

—এখন থেকে ভয় না ভাঙ্গালে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি ক'রবি শুনি? সেখানে তো আর কেউ আমার মত তোকে সব সময়ে আগলে বসে থাকবে না।

পিসিমার মনের পরিবর্ত্তন অলকা টের পায়নি। তাই এ ধরণের অপ্রত্যাশিত কথা শুনে সে গুম হ'য়ে বসে রইল।

পিসিমা বললেন, জানিস মা, রোববারে তোকে দেখতে আসবে। সেদিন যেন আর ধুলো মেখে রাক্ষুসী সেজে থাকিসনে। জামাই নিজে আসবে। হ্যাঁরে অলকা, পূজোর সময় অক্ষয় যে কাপড়খানা কিনে দিয়েছিল, সেখানা নোংরা ক'রে রাখিস নি তো?

—হালদারদের বাড়ীতে নেমনতন্ন গেলুম না সেখানা পরে! এরি মধ্যে ভুলে গেছ।

—তোকে নিয়ে আর পরি না বাপু; সেদিন তবে কোনখানা পরবি? তোর আর যে সব কাপড় আছে, আমার একখানাও পছন্দ হয় না। সেই লাল টুকটুকে শাড়ীখানা পরলে তোকে ঠিক দুর্গো প্রতিমার মতই দেখায়। মনে ক'রে কাল সকালেই আমাকে বের ক'রে দিস, অনুকূলকে কোলকাতা থেকে কাচিয়ে আনতে বলে দোব।

অলকা ঘাড় নেড়ে দুধের কড়া উনান থেকে নামিয়ে রাখলে।

—তোর বাপের আক্কেল যেন দিনদিন লোপ পাচ্ছে। ছেলেকে নিয়ে বেরিয়েছে এ জন্ম আর আরজন্ম। আমার যেন চব্বিশ ঘণ্টা এই বাড়ীর মধ্যে কয়েদী থাকা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। না বাপু, মরণ হ'লেই বাঁচি। হাড়-মাস কালি হ'য়ে গেল।

তীব্র অনুশোচনায় অলকার মন ঘুরপাক খেতে লাগল। কেন সে পিসিমাকে ভয়ের কথা জানাতে গেল। সে যদি না জানাত, তাহ'লে মৃত্যু-কামনা তাকে এম্নি ক'রে শুনতে হ'ত না।

অলকা মনে মনে ভাবতে লাগল। এবার তার বিয়ে হবে। পিসিমাকে ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে এবার তাকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে। আবার নতুন এক পৃথিবী সৃষ্টি হবে: নতুন আলো তার চোখ ঝলসে দিয়ে যাবে। মণিদির মত তারও ছেলে হবে। তাকে মা বলে ডাকবে।

অক্ষয়বাবুর কণ্ঠস্বর অলকার চিন্তার যোগসূত্র ছিন্ন ক'রে দিলে। মুরারীকে সে এতক্ষণ না দেখে অবলীলাক্রমে কাটিয়ে দিয়েছে। একবারও তার কথা সে ভাবিনি। এখনই এই, বিয়ে হ'লে না জানি সে কি ক'রবে। তখন হয়তো দু'চক্ষে তাকে দেখতে পারবে না। তার অভাব তাকে অন্যায়ভাবে ব্যথিত ক'রতে অক্ষম হবে।

মানুষ এতখানি অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে!

অলকা স্বার্থপর মানুষের মত আর ভাবতে পারলে না। বেগে বেরিয়ে গেল। মুরারীর স্নেহ তাঁর কাছে কোনদিন ম্লান হবে না। তাকে একদিনো চোখের আড়ালে রেখে সে স্বস্তিতে থাকতে পারবে না।

তাই প্রথম যেদিন অলকা শ্বশুর বাড়ী ঘর ক'রতে গেল, মুরারীও সঙ্গে রইল। কারুর কোন কথা সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে না। লোকে নিন্দে ক'রলে তাকেই ক'রবে। সে অপবাদ তার কাছে গৌরবের।

চৌধুরী পরিবারের কেহই মুরারীকে নিয়ে আসাটা অগৌরবের ব'লে মনে ক'রলেন না। বরং তাকে পেয়ে সকলের অন্তর খুসীর প্লাবনে উপছে উঠল। বাড়ীতে শিশুর কলকোলাহল ছিল না: সে এসে মুখরিত ক'রে তুলেছে গৃহের প্রত্যেকটি কোণ। তার দৌরাত্ম্যে ও অত্যাচারে সবাই সসব্যস্ত। অমন যে বড-বৌ, যিনি নিঃসন্তানতায় ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়েছেন, তিনিও যেন সর্ব্বদাই চঞ্চল, সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। বৃদ্ধ শিরীষ চৌধুরী, যাঁর দাবা খেলার ঝোঁক গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধি ছিল, তাঁরও আজকাল তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। কতদিনই বা এসেছে! এ'রিমধ্যে সকলকে কেমন আপন ক'রে নিয়েছে। চৌধুরী গিন্নির কোলে যেতে তার আপত্তি নেই। অহীন্দ্রর কাছে থাকলে সে অলকার খোঁজ করে না।

অলকা তাই স্বামীকে লুকিয়ে এসে জানায়, তুমি সত্যিই যাদু জান।

অহীন্দ্র উত্তর দেয়, হিংসে হয় বুঝি।

অলকা হেসে পালিয়ে যায়। সংসারের খণ্ড খণ্ড কাজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে তোলবার বাসনা তার প্রবল।

বড়-বৌ কিছুতেই অলকাকে কাজ থেকে বিরত ক'রতে পারেন না। অহীন্দ্র তো হাল ছেড়ে দিয়েছে। যখন খুসী হয় আসবে। আজ থেকে সে আর উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তার আগমনের প্রতীক্ষায় জেগে থাকবে না। বললেও যখন শুনবে না, তখন না বলাই ভাল। বলে বলে সে হার মেনেছে। এইবার দিনকতক না বলে দেখবে, ফল পাওয়া যায় কি না?

কথাগুলো নিজের মনে নাডাচাডা ক'রতে ক'রতে অহীন্দ্রর তন্দ্রা এসেছিল।

অলকা ঘরে ঢুকে দস্তুরমত চমকে উঠল। অন্যদিন সে এর চেয়েও বেশী রাতে এসে স্বামীকে জেগে থাকতে দেখেছে। আর আজ, এখনো

বোধ হয় দশটা বাজেনি—এরি মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। শরীরটা কি তবে ভাল নেই!

অলকা মিহি গলায় ডাকলে, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

ছ্যাঁৎ ক'রে অহীন্দ্রর তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল।

—আজ বুঝি খাটা-খাটুনি গেছে খুব।

—সে তো রোজই আছে।

—রোজ তো এমন সময় ঘুমিয়ে পড না।

—একই ভুল রোজ ক'রতে আর ইচ্ছে যায় না অলকা।

—কিসের ভুল! অলকা বিস্মিত হ'য়ে জানালে।

—ভুল নয় আমার, তোমার জন্যে দিনের পর দিন জেগে থাকা

—বাড়ীশুদ্ধ সবাই ঘোরাঘুরি ক'রবে আর আমি ঘরে এসে ঢুকব—তা আমি পারব না। তোমার আর কি?

পাছে নিস্তব্ধ রাত্রির নিঃসাড়তায় গলার স্বর অপরে শুনতে পায় এই আশঙ্কায় অলকা ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। হ্যারিকেনের আলোটা মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলছিল, সে নিভিয়ে খাটের নীচে ঠেলে রাখলে। মুরারী অচৈতন্য হ'য়ে ঘুমুচ্ছে। তার পাশের জায়গাটি খালি। সে সেইখানটায় শোবে। ঘরে আলো না থাকলেও নিজের জায়গাটি চিনে নিতে তার একটুও দেরী হয় না। তবু সে শুয়ে পড়ল না। বিছানার একাংশে বসে বললে, তাই বুঝি আমার ওপর রাগ ক'রেছ!

অহীন্দ্র নিরুত্তর।

—এ তোমার অন্যায় অভিমান। সত্যি বলছি. তখন এত লজ্জা করে যে কিছুতেই আসতে পারি না। তুমি কি বলতে চাও মন আমার তোমার কাছে আসবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে না?

—জানি না কি তা। জানি বলেই তো তোমার ওপর রাগ ক'রতে পারি না।

—তবে আজ ঘুমিয়ে পড়েছিলে কেন? তুমি তো জানতে যে আমি আসব।

—কিন্তু একটা কথা আমি ভেবে পাই না অলকা, আসবেই যদি জান তবে তখনই বা এত সঙ্কোচ, এত লজ্জা কিসের? বৌদি টৌদির ধারণা তুমি বুঝি সারারাত বারান্দায় বসে থাক। যে কথা জানা, তাকে আর জানাতে হয় না। আমাদের বিয়ে হ'য়েছে, একথা সবাই জানে।

—জানে বলে বুঝি সব কাজ ফেলে তোমার কাছে দৌড়ে আসতে হবে। এলেই বড় ছাড!

—কবে তোমাকে ধরে রেখেছি?

—সত্য-নারায়ণের সিন্নির দিন, মনে নেই? ভাগ্যিস দিদি ডাকলেন, তাই তো রেহাই পেলুম। নইলে তুমি ছাড়তে কি না? সত্যিই তুমি ভারী দুষ্ট! সবাই কি ভাববেন বল তো? লক্ষীটি, তুমি জেগে থেক।

এরপর অহীন্দ্রর নিজেকে সমর্থন করবার কোন দরকার হয় না। অলকা বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ ক'রলেও এ যুগের সভ্যতা ও কৃষ্টি বরদাস্ত ক'রতে পারেনি। এ অক্ষমতা সে বহুদিন পূর্ব্বেই সপ্রমাণ ক'রে দিয়েছে। অতি সাধারণ ভাবে সে মানুষ হয়েছে: আদর্শও তার অসাধারণ নয়। আইভি, মীর্ণা লিলি—এদের সঙ্গেও সে মিশেছে আবার কল্যাণী, প্রফুল্ল, লাবণ্যর জীবন যাত্রার সরল প্রণালী সে ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রেছে। আজ যদি সে আইভির মত স্বামীর হাত ধরে বেড়াত, মীর্ণা যেমন ক'রে গান গায়, তেম্নি ক'রে গান গাইত, লিলির ন্যায় শ্বশুর শাশুড়ীকে অগ্রাহ্য ক'রত, সত্যিই কি সে সুখী হ'তে পারত? একটা সংসারকে এম্নি ক'রে গভীর স্নেহে ভালবাসায় আপন ক'রে নিতে সমর্থ হ'ত?

যারা পারে পারুক, অলকা অতখানি বেহায়া হ'তে কোনদিন পারবে না।

ভাবতে ভাবতে তার চোখে ঘুম জড়িয়ে এল। আজ দুপুরে তার ঘুম হয়নি। অন্যদিন মুরারী থাকে বাড়ীতে। তাকে ঘুম পাড়াবার ফাঁকে সে-ও খানিকটা গড়িয়ে নেয়। আজ সে ছিল না। অহীন্দ্র লেবেঞ্চুসের লোভ দেখিয়ে দোকানে নিয়ে গিয়েছিল। তাই সে আজ ফুরসৎ পেয়েছে চিঠি লেখবার। ক'দিন ধরে সে বাবাকে চিঠি লিখবে মনে ক'রছে ; কিন্তু ঐ এক টুকরো সময়ও সে দিনের দীর্ঘতার মধ্যে খুঁজে পায় নি। রাত্রে ইচ্ছা থাকলেও হ'য়ে ওঠে না। দোয়াত কলম নিয়ে বসতে গেলেই আলো নিভে যায়। চেঁচাতে পারে না : অভিযোগ অনুযোগ করবার মত কথাও নয়। কাজেই আজকের দুপুরটি না ঘুমিয়ে সে চিঠি লিখেছে তিনখানা। একখানা বাবাকে, একখানা মণিদিকে, শেষের খানা পিসিমাকে।

ঘুম অলকার হবে না, এ কথা সে বেশ ভাল রকমই জানে। জেনে শুনেও সে শুয়ে পড়ল। সারাক্ষণ ঘোমটায় তার কপালের চুল ভিজে গেছে ; কাণের দু'পাশে ঘাম এসে জমেছে ; ব্লাউসটা পিঠের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। মাথার কাপড়টা নামিয়ে দিয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ব্লাউসের দু'টো বোতাম খুলে ফেলে তার মনে হ'ল যেন অনেকখানি আরাম পাওয়া গেল।

মাথার গোড়ার জানলা দিয়ে ঝির ঝির ক'রে হাওয়া আসছে। আজ সারাদিনই ঝড়ের মত হাওয়া বহেছে। গুমোট ছিল কাল। গাছের একটি পাতা পর্য্যন্ত নড়েনি। তিনটে বেজে গেল, তখনো অলকা জেগে। আজ হাওয়াটুকু গায়ে লাগতেই সে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। এইবেলা না ঘুমলেও পরে তাকে সাধ্য-সাধনা ক'রতে হবে না। নিদ্রিত মুরারীকে অতি সন্তর্পনে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সে ঘুমবার ভাণ ক'রে পড়ে রইল।

অনেকক্ষণ অলকার কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে অহীন্দ্র বললে, আমাকে জেগে থাকতে বলে নিজে তো দিব্যি ঘুমচ্ছো।

—তুমি এত সহজে ছাড়বে কি না? অলকা জানালে, জেগে আছি, বল না কি বলবে?

অহীন্দ্র কথা খুঁজে না পেয়ে বললে, মুরারীকে কাল ক্ষুদিরামের পাঠশালায় ভর্ত্তি ক'রে দোব। শুধু শুধু বয়েস বাড়িয়ে লাভ কি? যা হোক শিখতে তো হবে!

—বেশ তো, দিও না। এতে আমার আপত্তি করবার কি আছে? সে লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে; তাতে মুখোজ্জ্বল হবে আমাদের।

অহীন্দ্র অন্য কথা পাড়লে, চল একদিন কোলকাতায় থিয়েটার দেখে আসি। তোমাকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের।

—থিয়েটার আমার একদম ভাল লাগে না।

—তবে জু, পরেশনাথের মন্দির—

—ওসব আমি বাবার সঙ্গে গিয়ে দেখে এসেছি।

—আজকের রাতটি বেশ! যাবে অলকা—ছাদে? বেশ তো!

—মুরো যদি জেগে উঠে কাঁদে।

—না, ও কাঁদবে না।

—দরজা খুলতে গেলেই শব্দ হবে। কাজ নেই।

—আচ্ছা অলকা, তোমার আগ্রা দিল্লী কোথায় যেতে ভাল লাগে না?

—না।

—আশ্চর্য্য তুমি? কিছুই কি তোমার আকাঙ্ক্ষা নেই?

—কি ক'রে জানলে তুমি?

—যা কিছু বলতে যাই, সবেতেই তো তোমার অনাসক্তি। এখন

যদি ঘুরে ঘুরে না বেড়াবে পরে কি আর সংসারের মধ্যে ঢুকে পড়লে বেরুবার সময় পাবে?

—না-ই বা পেলুম। সংসারকে ভালবাসার চেয়ে মেয়েদের আকাঙ্ক্ষার আর কোন বস্তু আছে না কি?

—সংসারে বাইরে বুঝি পৃথিবী নেই।

—সে পৃথিবীতে আমার স্থান নয়।

—কেন তুমি নিজেকে এতখানি বঞ্চিত ক'রছ অলকা, তা আজো বুঝতে পারলুম না।

—ঘুমিয়ে পড়। বারটা বেজে গেছে। ভোরে উঠেই তো আবার দোকান খুলতে হবে।

—তোমার বুঝি ঘুম পেয়েছে?

—পাবে না? দুপুরে একটুও শুইনি।

—আর একটু জেগে থাকতে পারবে না অলকা? আবার তো সেই কাল রাত্তিরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

—দিনের বেলায় তোমার কাছে আসতে পারি না বলে তুমি কি রোজই ওই কথা বলবে!

—এলে তো আর আমার বলবার মুখ থাকে না। এলেই পার।

অলকা কথার কোন জবাব দিলে না। মুরারীর দিকে আরো সরে গেল। অহীন্দ্র যে তাকে আঘাত দেবার জন্যে একথা বলেনি, তা সে জানে। তবু তার মনে হ'ল, সে যেন এই দুর্ব্বলতার সুযোগটুকু নিয়ে ক্ষমতার অপপ্রয়োগের সুবিধা নষ্ট হ'তে দিতে চায় না। এতই বা ভয় কিসের? সব মেয়ে তো আর সমান নয়। সকলে তো আর মীর্ণার মত স্বামীর মন জুগিয়ে চলতে পারে না। সে যদি আইভির ন্যায় টুকরো টুকরো কথায় নিজেকে সুপ্রকাশ ক'রতে পারত, স্বামীর মনঃপুত হ'ত! লিলির মত সে যদি অভিনয়ও শিখত, স্বামীর

অসন্তোষের কোন কারণ থাকত না। ওদের সে মনে মনে ঘৃণা করে ; ওদের নারীত্বকে সে ধিক্কার দেয়। যারা সংসারের মধ্যে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারলে না, তারা বেঁচে থাকতে চায় কিসের অধিকারে?

অলকা দারুণ ঘামতে লাগল। কতদিন যে সে নিজের আদর্শে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, সেই কথা ভেবে সে শিউরে উঠল। এমন একদিন হয়তো তার জীবনে আসবে ; যেদিন মুরারীর অদর্শন তাকে আর চঞ্চল ক'রে তুলতে পারবে না। ছোট দেওরটির ভালবাসা সে দু'পায়ে থেঁৎলে দিতে ইতস্ততঃ ক'রবে না। পিসিমার স্নেহ, বাবার আদর সে অবলীলাক্রমে বিস্মরণের পথে ঠেলে দেবে। সত্যিই কি সে মুরারীকে ভুলে গিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে? এই সংসারের বাইরে গিয়ে অন্য কোথাও মহোল্লাসে বিচরণ ক'রতে সমর্থ হবে?

অলকা মুরারীকে দু'হাতে চেপে ধরলে।

অহীন্দ্র অনুচ্চকণ্ঠে বললে, বললুম বলে বুঝি রাগ ক'রলে?

অলকা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, সারারাত কি ঘুমতে দেবে না?

অহীন্দ্র বুঝলে অলকার মেজাজ ক্রমশঃ রুক্ষ হ'য়ে আসছে। আর কিছু বললে সে বারান্দায় গিয়ে বাকী রাতটুকু জেগে বসে থাকবে।

মধ্যরাত্রির নৈঃশব্দ ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে এল।

অহীন্দ্র পাশ ফিরে ঘুমবার চেষ্টা ক'রলে।

ছ'টা বেজে গেছে, তখনো অহীন্দ্র অকাতরে ঘুমচ্ছে। অলকাও এত দেরীতে কোনদিন ওঠেনি। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গতেই সে চোখ চেয়ে দেখলে রোদে চারিদিক ভরে উঠেছে। তাড়াতাড়ি ব্লাউসের বোতাম এঁটে নিয়ে সে অসংলগ্ন শাড়ীখানা সংযত ক'রে নিলে। কি যে ভাববে সবাই, সেই চিন্তাই তার প্রবল হ'য়ে উঠল। নিঃশব্দে মৃদু

পদসঞ্চারে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্বামীকে পর্য্যন্ত জাগিয়ে দেবার তার অবকাশ মিলল না।

রোজই অলকা এম্নিতরো এগিয়ে যায়। নিজের অপটুতা প্রতি কার্য্যে ধরা পড়ে, তবু তার অন্তহীন অধ্যবসায় সব তাতেই। প্রতিদিনের নির্দ্ধারিত কাজগুলো সেরে, খিড়কির ঘাটে কাপড় কেচে যখন সে ঘরে এসে ঢোকে, ততক্ষণে অহীন্দ্র দোকানে বেরিয়ে যায়। সে তখন মুরারীকে নিয়ে পড়ে। এই সময়টিতে তার অন্য কোন কাজ থাকে না। বড়-বৌকে রান্নার সাহায্য ক'রতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তিনি নানা কারণ দেখিয়ে তাকে ফিরিয়ে দেবেন। সত্যিই তো, যখন তার ছেলে পুলে হবে, সে কি আর সংসার থেকে মুখ তোলবার অবসর পাবে!

অলকা ভিজে কাপড়েই ঘরে ঢুকল।

মুরারী টেবিলের ওপর থেকে ঘড়িটা পেড়ে নিজের হাতে বাঁধবার জন্যে গভীর ভাবে নিজেকে নিযুক্ত ক'রেছে। অলকার ভিজে কাপড়ের ফট্ ফট্ শব্দ পর্য্যন্ত সে টের পায়নি। পেলে হয়তো সে ঘড়িটা যথাস্থানেই রেখে দিত। একদিন সে এর জন্যেই চড় খেয়েছিল।

অলকা প্রথমে ঘড়িটা ভুলিয়ে টেবিলে রেখে দিলে। তারপর শাড়ী বদলে নিলে। ঘড়ির দাম যত না হোক, বিয়ের বলে অহীন্দ্রর কাছে ওই জিনিষটা অমূল্য।

মুরারী হতাশ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অলকা শাড়ীখানা ছাদে শুকতে দিয়ে এসে মুরারীকে পড়াতে এল। কিছুতেই সে পড়বে না। অভিমানে তার চোখের কোণে জল এসে জমেছে। কিন্তু স্নেহের দাবির কাছে অভিমান সব ভেসে গেল। সে বই নিয়ে বসল।

মুরারী এদিকে যত দুষ্টুমিই করুক না কেন, মেধাবী। দিনের মধ্যে সে কতটুকু সময়ই বা পড়ে; তবু এই অল্পদিনের মধ্যে সে বর্ণপরিচয়ের অর্দ্ধেকটা আয়ত্ত ক'রে ফেলেছে। ধারাপাতের নামতা পর্য্যন্ত সে অনর্গল আওড়ে যেতে পারে। এতে অলকার আনন্দই সব চেয়ে বেশী।

মুরারী একমনে পড়ে যাচ্ছিল, বড পাতা, লাল ফুল। আর অলকা নির্ব্বিকার চিত্তে তার মুখের পানে একরত হ'য়ে তাকিয়েছিল। ওর মুখখানা নাকি অবিকল মায়ের মত। ওই রকম ডাগর চোখ, টানা ভ্রূ; এমন কি হাসিটি পর্য্যন্ত। তাই যখনই তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে; মায়ের কথাই অলকার বেশী ক'রে মনে পড়ে। মা-ও অমিতরো মিষ্টি হাসত। পিসিমাকে সে কতদিন বলতে শুনেছে, মাকে সবাই কত ভালবাসত ওই হাসির জন্যে। মায়ের কোন গুণই সে পায়নি। না পেয়েছে শান্ত স্বভাব, না পেয়েছে লাবণ্যময়ী রূপ। তবু যদি সে উত্তরাধিকারিণী সূত্রে ওই হাসিটুকুও পেত, কোন অনুতাপ তার থাকত না। সকলের হৃদয় সে উজ্জ্বল হাসির বিনিময়ে জয় ক'রতে পারত।

অলকা অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল। ছোট দেওরটির আকস্মিক আগমন তার চিন্তার ধারা কেটে দিলে।

—তোমাকে মা কি দেবার জন্যে ডাকছে বৌদি?

অলকা তখুনি উঠে পড়ল। যাবার সময় মুরারীকে বলে গেল, পালিয়ে যেও না যেন এখন। আমি এখখুনি আসছি।

ফিরে এসে অলকা দেখলে মুরারী তখনো জল পড়ে, পাতা নড়ে বানান ক'রে ক'রে পড়ছে। সস্নেহে তাকে কোলের ওপর বসিয়ে সে বললে, যাও, এইবার খেলা করগে। বিকাশ তোমাকে ডাকতে এসেছে।

অলকার গলা আঁকড়ে ধরে মুরারী বললে, আমায় ঘড়ি কিনে দেবে দিদি ?

—দোব। বড় হও। এখন দিলে ভেঙ্গে ফেলবে যে !

—না দিদি, ভাঙ্গব না।

—আচ্ছা, আচ্ছা দোবখন। তার কপালে, গণ্ডে চুমু দিয়ে অলকা বললে, এখন তুমি খেলা ক'রতে যাও।

মুরারী দিদিকে ফেলে পালিয়ে গেল। খেলার সাথী বিকাশ এসেছে। দু'জনের মধ্যে ঝগড়াও যত, ভাবও তত।

অলকার এইবার বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশ। কিন্তু অলসভাবে বসে থাকতে সে মোটেই পারে না। হয় দেওরটির পড়ার ঘরে গিয়ে সে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, না হয় দিদির ফাইফরমাশের জন্যে সে সর্ব্বদাই রান্নাঘরে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বসে থাকে। কোনদিন হয়তো তাকে মাছ কুটতে হয়, কোনদিন বা ছোট দেওরটিকে ভাত বেড়ে দিতে হয়। বাকী সময়টুকু সে দিদির সঙ্গে গল্প করে। এর মধ্যেও সে সজীবতার লক্ষণ খুঁজে পায়। মুখ বুজিয়ে ঘরের কোণে বসে থাকা যে কি অস্বস্তিকর, তা সে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

অলকা ছোট দেওরটিকে ভাত বেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিনয়েন্দ্র বললে, আমাদের ইস্কুলে প্রাইজ বৌদি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসবেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বৌ আসবেন। তুমি যাবে !

—আমি গেলে তো আর প্রাইজ দেবে না।

—ওরা না-ই বা দিলে। আমি যে বইখানা পাব তোমাকে দোব।

—আমাকে দিলে তো আর তোমার পাওয়া হবে না।

—তুমি পেলেও আমার আনন্দ হবে।

অলকা তার অফুরন্ত আনন্দ একটি কথার আঘাতে চূর্ণ ক'রে দিতে পারলে না। বললে, তুমি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে তো ?

—হুঁ। বিরাট ঘাড় নেড়ে বিনয়েন্দ্র জানালে, ঠিক নিয়ে যাব।

অলকা দুধ আনতে চলে গেল।

বিনয়েন্দ্রর মন খুসীতে ভরে উঠল। অলকা ফিরে আসতেই সে বললে, কোন্ ঘরে আমাদের ক্লাশ হয়, তোমাকে দেখিয়ে দোব বৌদি।

অলকা চুপ ক'রে রইল। মিথ্যা আশার বাণীকে প্রশ্রয় দেওয়া সমীচীন নয়। হয়তো প্রাইজের আনন্দে আজকের ব্যাকুলতা তার শিশু মন খানিক পরেই ভুলে যাবে। কিন্তু নিজের অন্তরে যে ফাঁকটুকু রয়ে গেল, তাকে সে ফাঁকি দেবে কি দিয়ে? বিনয়েন্দ্র উঠে গেলে পর সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

বড়-বৌ বললেন, তুমি এইবেলা ছোট-বৌ মুরারীকে নাইয়ে খাইয়ে দাও। তোমার ভাসুর এসে পড়লে ওকে কি ভুলিয়ে রাখতে পারবে? বায়না ধরলে তো আর রক্ষে নেই!

—তার কি এখন টিকি দেখতে পাওয়া যাবে?

—নিধিকে না হয় ধরে আনতে বলে দাও।

অলকা নিধিকে ডাকতে পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা ক'রতে লাগল। বিকাশদের বাড়ী বেশী দূরে নয়। সেখানে যে নেই একথা সুনিশ্চিৎ। তাহ'লে এতক্ষণে তার চলে আসবারই কথা। তবু সে অধীর হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল আগমনের সম্ভাবনায়।

শাশুড়ির বাতের শরীর। বেশী নাড়াচাড়া ক'রলে চাগিয়ে ওঠে। ডাক্তারে তাই উঠতে নিষেধ ক'রেছেন। তবু শুয়ে শুয়ে যতদূর সম্ভব তিনি তত্ত্ব অনুসন্ধান ক'রতে ভোলেন না। জানলার ফাঁক দিয়ে অলকাকে দেখতে পেয়ে তিনি প্রশ্ন ক'রলেন, হ্যাঁ বৌমা, বিনয় ইস্কুলে চলে গেছে তো?

—হ্যাঁ।

—মুরারীর সাড়া শব্দ পাচ্ছি না যে?

—নিধিকে তো পাঠিয়েছি।

—এলেই খাইয়ে দিও বাপু। এই গরমের দিনে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্দি।

নিধির কোলে মুরারীকে দেখতে পেয়ে অলকা সেইদিকে এগিয়ে গেল।

—দুষ্টু ছেলে কোথাকার! খেলতে পেলে বাড়ীর কথা আর মনে থাকে না। কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে অলকা মুরারীকে নিজের কোলে টেনে নিলে।

—আজ আমি ঘুঁড়ি উড়িয়েছি দিদি।

—দুষ্টুমি ক'রলে রণেনকে বারণ ক'রে দোব।

—তা হ'লে আমি নাইব না। মুরারী অলকার কোল থেকে নেমে পড়বার উপক্রম ক'রলে।

—আচ্ছা দোব না। হ'য়েছে তো?

অলকা তেল মাখাতে গেল। মুরারী বেঁকে বসল।

—আমি সাবান মাখব দিদি।

অলকাকে হার মানতে হল। এ পরাজয় তার কাছে গৌরবের। ভাইটির মুখ চেয়েই সে একদিন বিয়ে ক'রতে পর্য্যন্ত রাজী হয়নি। বিয়ের পরে যদি সে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে: যদি তার স্নেহের ভাগ নিজের অজ্ঞাতসারে অপরকে দিয়ে দেয়। মানুষের দুর্ব্বল মন। তাই সে ক্রমাগত চেষ্টা ক'রে এসেছে, দু'জনের মাঝখানে যাতে না কোন বাধার উন্নত প্রাচীর গড়ে উঠতে পারে। পৃথিবীতে এই একটি প্রাণীর জন্যে তার কোন উদাসীন্য নেই,—বিষণ্ণতাও নেই, নিজের জীবন সম্বন্ধে কোন স্মৃতিই সে মনে ধরে রাখে না। নিঃসঙ্গ জীবনের প্রারম্ভে সে প্রথম যাকে পেয়েছে, তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিরন্তর শান্তি যেচে নেবে না কোনদিন। সেই পণই আজ তাকে জয়যুক্ত ক'রে তুলেছে।

এর জন্তে যে কার্ কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রবে ভেবে পায় না। অনুকূলদার কাছে না এই সংসারের প্রত্যেকের কাছে। কে তার জীবনে সুখ শান্তি আরাম, সব আশাতীত ভাবে ঢেলে দিয়েছে!

মুরারীকে খাওয়ান যার তার কাজ নয়। পারে শুধু অলকা আর অহীন্দ্র। অহীন্দ্র যে তার এতখানি আপনার হ'য়ে যাবে, একথা অলকা ভাবতেও পারেনি। এক এক সময় তাই তার মনে হয়, সত্যিই কি সে যাদু জানে।

ঘড়ি কিনে দেবার লোভ দেখিয়ে অলকা আজ অতি সহজেই নিস্তার পেলে। এখন ভালয় ভালয় ঘুমিয়ে পড়লেই সে বাঁচে। ঘুম পাড়াবার ব্যর্থ প্রয়াসে অনেকখানি সময় সে কাটিয়ে দিলে। আর তার একটা মুহূর্ত্তও বসলে চলবে না। অনেক কাজ তার অসমাপ্ত পড়ে রয়েছে। কাছারী বাড়ী থেকে ভাসুর অনেকক্ষণ হ'ল ফিরে এসেছেন। ঠাঁই ক'রে দেবার ভার তার ওপর। পান সেজে প্রত্যেকের ঘরে রেখে দিতেও হয় তাকে। তবুও সে আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'রতে পারত। এখনো তো তিনি তেল মাখেননি। কিন্তু এদিকে স্বামীর আসবার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। এসে পড়লে এই ঘর থেকে তার বেরুন যে কত কঠিন, তা তার অজানা নেই।

অলকা উঠে দাঁড়াতেই মুরারী নড়ে উঠল।

—লক্ষী ছেলে, এখন ঘুমিয়ে পড়। ঘুম থেকে উঠে বিকাশের সঙ্গে খেলা ক'রতে যাবে।

অলকা দ্রুত পদে বেরিয়ে গেল।

যথা সময়ে অহীন্দ্র এল। অলকার যেটুকু স্বচ্ছ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল তা-ও ঘুচল। লম্বা ঘোমটা টেনে ঘুরে বেড়ানর চেয়ে রান্নাঘরে বসে থাকাকে সে সঙ্গত মনে করে। যতক্ষণ না স্বামী ঘরে দিয়ে ঢোকে, প্রলয় হ'য়ে গেলেও সে বেরোয় না। আজ কিন্তু তাকে

বেরুতে হল, যখন সে মাকে বলতে শুনলে, ছোট বৌমা, শুনে যাও এদিকে।

দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে সমস্ত মুখখানাকে আড়াল ক'রে অলকা তাঁর সামে গিয়ে দাঁড়াল।

—অহীন ঘড়ি খুঁজে পাচ্ছে না। টেবিলটা ভাল ক'রে খুঁজে দেখগে তো বৌমা।

অলকার বুক ছ্যাঁক ক'রে উঠল। সর্ব্বাঙ্গ থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল।

অহীন্দ্রর তখনো গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে, ঘড়িটার কি হাত-পা হ'ল, শুনতে চাই। সকালে বেরুবার সময়ও দম দিয়ে গেছি—

অলকা সমস্ত লজ্জা জলাঞ্জলি দিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরে মুরারীকে না দেখতে পেয়ে সে শিউরে উঠল।

—আমার ঘড়ি কোথায় গেল ?

—চেঁচালে বুঝি ঘড়ি আসবে ! খুঁজে দেখেছ টেবিলটা !

অহীন্দ্র একটুখানি গুম হয়ে রইল। পরে বললে, কাণা হ'য়ে যাইনি এখনো।

অলকা টেবিল তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজতে লাগল।

—তোমার আদরের ভাইটি কোথায় গেল ? ডেকে নিয়ে এস তাকে, নিশ্চয়ই সে নিয়েছে। অহীন্দ্র ঘরের কোণ থেকে চাবুকটা হাতে নিয়ে মুরারীর নাম ধরে বার কয়েক উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলে।

মুরারী খাটের নীচে জড় সড় হ'য়ে লুকিয়েছিল। বিরাট চীৎকারে কেঁদে ফেললে।

—বেরিয়ে আয় শীগ্‌গির, হতভাগা ছেলে কোথাকার! তোর আস্পর্দ্ধা ভাঙ্গছি ! অহীন্দ্র রাগে ঘরময় পায়চারী ক'রতে লাগল।

মুরারীকে টেনে বার ক'রলে অলকা।

চাবুকটা সামে প্রসারিত ক'রে অহীন্দ্র বললে, ঘড়ি কে নিয়েছে ?

মুরারী ভয়ে কথা বলতে পারলে না। ইঙ্গিতে সে খাটের তলা দেখিয়ে দিলে।

অহীন্দ্র পরম কৌতূহলে চেয়ে দেখলে, নীচেকার সমস্ত মেঝেটিতে ঘড়িটা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে। রাগে সে চাবুকটা একবার মুরারীকে লক্ষ্য ক'রে তুললে; কিন্তু মারতে পারলে না। আত্মসংবরণ ক'রে বললে, ও ছেলের এ বাড়ীতে ঠাঁই হবে না। ভেবেছিলুম—

অলকা কেঁদে ফেললে। বললে, দোহাই তোমার, তুমি আর চেঁচিও না। আজই আমি ওকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রব।

বড়-বৌ রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন। মা চেঁচিয়ে উঠলেন, অহীন শুনে যা বাপু; তোদের নিয়ে আর পারি না। ভাসুর ঘর থেকে জিজ্ঞেস ক'রলেন, হ'য়েছে কি?

কিছুই হয়নি। ঝড় উঠেছে। আবার থেমে যাবে।

ঝড় থেমে গেল বটে কিন্তু ভেঙ্গে দিয়ে গেল দমকা হাওয়ায় একটা সংসারের সুখময় স্বপ্ন।

মুরারীকে তপনপুরে পাঠিয়ে দেবার পর থেকে অলকার মন ভেঙ্গে গেছে। আজকের ধূসর সন্ধ্যার মত বাণীহীন বিষণ্ণ বিধূর সন্ধ্যা সে পূর্ব্বে দেখে নি। কলমুখরিত বাড়ীখানির মধ্যে থেকেও তার প্রতিনিয়ত মনে হয় সে যেন নিতান্তই নিঃসঙ্গ। সারা জীবনের আনন্দটুকুকে নির্ব্বাসন দিয়ে তার জীবন ধারণের আয়োজন সম্পূর্ণ অর্থহীন। মায়ের বিছানার এক প্রান্তে বসে ম্লান প্রদীপ শিখার দিকে চেয়ে সে এই কথাই ভাবছিল।

মা বললেন, তুমি বৌমা, বেয়াইকে চিঠি লিখে দাও যেন মুরারীকে দিয়ে যায়। ওঁনার তো এই শরীর। অহীনও তো বললে শুনবে না। যা একগুয়ে ছেলে!

—না মা, সে শাস্তি পাক।

—মা-মরা ছেলেকে শাস্তি দিতে গেলে সে শাস্তি যে নিজেকে ভোগ ক'রতে হয় মা। তুমি আমার কথা শোন বৌমা, চিঠি লিখে দাও। জীবনের চেয়েও তো আর একটা ঘড়ির দাম বেশী নয়। তাই যখন যত্ন ক'রেও রাখা যায় না, সামান্য একটা ঘড়ি। ভগবান মুখ তুলে চাইলে, ঘড়ি অমন কত হবে।

ঘড়ির জন্যে অলকার দুঃখ নেই। দুঃখ তার, যার কাছে সে এই সংসারের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সহানুভূতি আশা ক'রেছিল, তার কাছ থেকে নির্ম্মম আঘাতের পরিচয় পেয়েছে বলেই। অন্য কেউ তাকে চাবুক নিয়ে মারতে গেলে সে নিজেকে অপমানিত বোধ ক'রত না। বরং তাতে সে উৎফুল্ল-ই হ'ত। মনকে সে সান্ত্বনা দিতে পারত যে, সকলে তো আর তার অন্তরালবর্ত্তিনী আকাঙ্ক্ষার সন্ধান পায়নি। কিন্তু এখন সে কি যুক্তি-তর্ক দিয়ে তার মনকে বোঝাবে?...এতদিনের ভালবাসা শুধু অভিনয় ছাড়া আর কি? এক টুকরো করুণা লাভের বিনিময়ে সে যে তাকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করেনি; একথা সে আজ কেমন করে অবিশ্বাস ক'রবে? যদি তার ব্যবহারে নিজের কৃতকর্ম্মের জন্যে বিন্দুমাত্র অনুতাপের লক্ষণ প্রকাশ পেত, এতখানি মনোমালিন্যের সৃষ্টি হ'তে পারত না। সে যত চেয়েছে একটি দিনের ঝড়কে মন থেকে মুছে ফেলতে, স্বামীর বীতরাগ ততই তাকে জেদী ক'রে তুলেছে। আজ সে এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছে যেখান থেকে এগিয়ে যাওয়াও চলে না, পেছিয়ে আসাতেও বিপদের সম্ভাবনা। মুরারীকে সে যদি আঁকড়ে থাকতে চায় স্বামীর সাহচর্য্য তাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে; আবার স্বামীকে সন্তুষ্ট করাই যদি তার ধর্ম্ম হয়, মুরারীর স্নেহ তাকে চিরদিনের মত জলাঞ্জলী দিতে হবে। কি ক'রবে সে? অন্তহীন

আকাশে এলোমেলো হাওয়ার মত চিন্তাগুলো তার মনকে বিকল ক'রে তোলে। সে আর ভাবতে পারে না। শুধু ভাবে, কি ক'রবে সে ?

অলকা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে নড়ে বসল।

মা বললেন, ভেবে আর কি ক'রবে বৌমা ? সংসারের ওপর কি তাব'লে রাগ করা চলে! কত সইতে হয়, কত ঝড়-ঝাপ্টা মাথার ওপর দিয়ে যে চলে যাবে, তার কি ইয়ত্তা আছে? তবু স্বামী, সংসার, পুত্র, এরা কখনও পর হয় না। অহীন যদি রাগের মাথায় একটা কুকর্ম্ম ক'রেই ফেলে, সে কি ক্ষমা পাবারও অযোগ্য? তুমি বুদ্ধিমতী: তুমি যে অন্যায় ক'রবে না, তা আমি জানি। তাই বলছি মা, তুমি মুরারীকে আনবার ব্যবস্থা কর। ওর সেই বুকফাটা কান্না আমি যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

একথা শুনে শুনে অলকা এতদূর অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে যে সামান্য পরিবর্ত্তনও তার মধ্যে পরিলক্ষিত হ'ল না। যেমন বসেছিল দীপশিখার দিকে চেয়ে, তেম্নি রইল।

—অহীন যদি জেদ ক'রে বসে থাকে, তুমিও কি মা অবুঝ হবে? মুরারীর কথা কি তোমার একবারও মনে পড়ে না?

—তার কথা আর ভাবি না মা। এখন তো আর নিতান্ত কচি ছেলেটি সে নেই যে ভোলালেও ভুলবে না। কথাগুলো উচ্চারণ করবার সময় অলকার বুক ব্যথায় টন্ টন্ ক'রে উঠল।

মা হেসে বললেন, সে না হয় তোমাকে ছেড়ে ভুলে থাকতে পারে কিন্তু তুমি পারবে কেন মা?

—একটা মাস কি আমার কাটল না?

—দিন কি কারুর জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে মা? কারুর জন্যেই কারুর আটকায় না। সংসার এম্নিই বিচিত্র।

সংসারের অপরূপতার মধ্যে অলকা সৌন্দর্য্য খুঁজে পায় না।

সে দেখতে পায় পৃথিবীর চারিধারে বীভৎসতার প্রতিমূর্ত্তি : অকৃতজ্ঞতার প্রহরী।

অলকা উঠে পড়ল বড়-বৌয়ের স্নেহমিশ্রিত আহ্বানে।

—খাবে এস ছোট-বৌ।

ক্ষিদে নেই, শরীর ভাল নয় ইত্যাদি কোন অজুহাতেই অলকা এই স্নেহশীলা নারীটির কাছে পরিত্রাণ পায় না। সে মাঝে মাঝে নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে যায় এই কথা ভেবে যে, এই পৃথিবীতে এমন একজনও আছে, যার কাছে তার জীবনের মূল্য কোনদিনই ম্লান হ'য়ে যাবে না। স্নেহ দিয়ে, মমতা ঢেলে যে শুধু তার বাঁচবার আশাকে বলবতী ক'রে তুলতে পারে।

কিন্তু কি সুখে অলকা বাঁচবে? একখণ্ড দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বেঁচে থাকার মধ্যে না থাকে বৈচিত্র্যের স্বাদ, না পাওয়া যায় অভিনবত্বের সন্ধান। যেটুকু উত্তাপ তার মনকে এতদিন উত্তপ্ত ক'রে রেখেছিল নৈরাশ্যের বৃহৎ অন্ধকারের মধ্যে সেটুকুও অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। মন তার দিনে দিনে যত অবিশ্বাসী হ'য়ে উঠতে লাগল, শরীরের সামর্থ্যও সেই পরিমাণে হ্রাস পেতে লাগল। আশাশূন্যতার দীর্ঘ অবলম্বন তাকে নিস্তেজ ক'রে দিয়েছে। নিরুৎসাহের অনুত্তেজিত ঢেউ তাকে সোজা দাঁড়াতে পর্য্যন্ত দেয়নি।

সুষুপ্ত ঘরে এসে অলকা শুয়ে পড়ল। রজনীগন্ধার সৌরভ যদি হাওয়ায় ভেসে আসে, তাতে তার কি এসে যায়! ছাদের ওপর জ্যোৎস্নার প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে যদি রাত-জাগা পাখী ডেকেই ওঠে, তার আকুল হবার প্রয়োজন হবে না। পাশের খালি জায়গাটির দিকে চেয়ে তার মন হা-হা ক'রে উঠল। বুকখানা দু'হাতে জোর ক'রে চেপে সে চোখ বুজিয়ে রইল।

অহীন্দ্র যে এত সকাল-সকাল দোকান বন্ধ ক'রে ফিরে আসতে

পারে ; এ কথা অলকা কোনদিন কল্পনা করেনি। তাই দরজায় খুট্ ক'রে শব্দ হ'তেই সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল।

অহীন্দ্র বললে, চমকে উঠলে কেন অলকা ?

—তুমি তো এসময় কোনদিন আস না ? অলকা দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখখানি ঢেকে ফেলবার আয়োজন ক'রলে।

—এখানে তুমি-আমি ছাড়া আর কে আছে যে ঘোমটা টেনে দেবার তোমার এত দরকার হ'য়ে পড়ল। তুমি কি চিরদিনই এম্নিভাবে নিজেকে রহস্যময়ী ক'রে রাখবে ? তোমাকে জানতে দেবে না, চিনতে দেবে না ! অহীন্দ্র বিছানায় গিয়ে বসল। অন্তরের বিক্ষোভতা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিলে। একটা মাস সে নিজের স্বামীত্বকে বজায় রাখতে গিয়ে স্ত্রীর প্রতি যে পরিমাণ অবিচার ক'রেছে, তার জন্মে মনস্তাপের তার অন্ত রইল না। কি যে অস্বস্তির মধ্যে তার এতগুলো দিন কেটেছে ; তা সে ব্যক্ত করেনি বটে কিন্তু জানতে আর কারুর বাকী নেই। দোকানে গিয়েও সে মন বসাতে পারেনি। বাড়ী ফিরে এসেও সুশৃঙ্খলিত ঘরখানি দেখে বেদনায় তার অন্তর গুমরে কেঁদে উঠেছে। মনের বিশৃঙ্খলা সে হাজার চেষ্টা ক'রেও তাড়াতে পারেনি। জেগে থেকে তার আনন্দ নেই ; ঘুমিয়েও সে তৃপ্তি পায়নি। নিরালম্ব জীবন তাকে একটা দিনও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। এভাবে সে বেঁচে থাকতে পারবে না। মনের শূন্যতাকে সে আজ আর আঁকড়ে ধরে রাখতে পারলে না। পরিম্লান নির্ব্বিঘ্ন ভাস্কর মূর্ত্তির সাম্নে এগিয়ে গিয়ে সে নিজের ভীরুতা প্রকাশ ক'রে ফেললে, তোমার শরীর দিন দিন কি হ'য়ে যাচ্ছে, আরশিতে দেখেছ কোনদিন ! মুরারীকে ছেড়ে তুমি যে থাকতে পারবে না, সেইদিনই তো তোমাকে বলেছিলুম। রাগের মাথায় পাঠিয়ে তো দিলে ! এখন কি ক'রবে শুনি ?

—ক'রব আর কি ? যেমন আছি, তেম্নি থাকব।

—এ ভাবে তুমি বেঁচে থাকতে পারবে না। চল, কাল আমরা মুরারীকে নিয়ে আসি।

—তাকে তুমি নিয়ে আসতে পাবে না। সে মরুক, তা'তেও আমার দুঃখ নেই।

—তোমার কি একটুও মায়া দয়া নেই?

—মায়া দয়ায় সংসার ভোলে না।

—একটা দিনের অভিমান কি তোমার কোনদিনই ভাঙ্গবে না অলকা?

—অভিমানের কথা এ নয়। ছেলে তার বাপের কাছে থাকবে না!

—এ কথা তো আগে তোমার মনে হয়নি?

—আগে পৃথিবীকে চিনতে পারিনি। আগে ভেবেছিলুম অভিনব ছন্দে আর সুরে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাব। অনাবশ্যক জীবনের কথা কোনদিন ভাবিনি। কিন্তু আজ জীবনের ওপর অশ্রদ্ধা ভাব এত এসে জমেছে যে বেঁচে থাকতে আর এক তিলও ইচ্ছে নেই।

—অলকা—উত্তেজিত হ'য়ে অহীন্দ্র জানালে, মাতৃত্বের অন্ধ দাবি কি তোমায় বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না?

—না। বাঁচব না বলেই আমার এ কৃচ্ছ্র সাধন।

—বাঁচতে হবে তোমাকে অলকা। তোমার জন্যে তোমাকে বাঁচতে বলি না। একটি নিরীহ জীবন তোমার জীবনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে আছে, তার জন্যেও কি তুমি বাঁচতে পারবে না?

—আমার বেঁচে থাকা নিরর্থক। তিমির রাত্রির পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার নিরানন্দময় জীবনে অভিশাপের মত প্রতিনিয়ত আমাকে চেপে ধরে। আমি পারি না নিজের অভিশপ্ত আত্মাকে বয়ে বেড়াতে।

—পারবে অলকা, পারবে। মুরারী এলেই তোমার সকল দুর্ব্বলতার অবসান ঘটবে। আমি-ই তাকে তাড়িয়েছি, আমি-ই তাকে নিয়ে আসব।

অলকা আগুনের ন্যায় জ্বলে উঠল। বললে, তাকে আনতে যেতে পাবে না। সে এলে আমি এ বাড়ীতে থাকব না।

—নিজের কথাটাই কি তোমার কাছে বড় হ'ল অলকা? আমি কি তোমার কেউ নই?

—তুমি আমার সর্ব্বস্ব। আমার ইহলোকের দেবতা; আমার পরকালের কাণ্ডারী। তাই তোমাকে ছেড়ে মুরোর স্নেহে ঝাঁপিয়ে পড়িনি।

কথাগুলো অহীন্দ্রর হৃদয়ে এনে দিলে চেতনার নব উন্মেষণ: অনুভূতির উন্মুক্ত বিকাশ। এতগুলো দিনের অপচয় তাকে মর্ম্মাহত ক'রলে। কেন সে নিজেকে গৌরবময় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে অলকাকে অবহেলা ক'রেছে? বোবা অথচ সতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সে স্ত্রীর মুখের পানে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর বললে, এই শরীর নিয়ে বেশী ভেব না। শুয়ে পড়।

অলকা শুয়ে পড়ল। নতুন ক'রে ভাববার মত তার শক্তি ছিল না। রাত্রিব নির্ব্বাক নিঃশব্দতায় ঘরখানি আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ল।

সকালে শয্যাত্যাগ ক'রে অলকা যেমন অকর্ম্মণ্য হ'য়ে বারান্দায় বসে থাকে, আজো তার ব্যতিক্রম হয়নি। একে অন্তঃসত্বা: তার ওপর মনের দুর্ব্বলতা। শেষকালে কোথাও পড়ে গিয়ে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। বিনয়েন্দ্রর সকালে ইস্কুল। মুরারীও নেই। সময় তার তাহ'লে কাটবে কি ক'রে? এম্নিভাবে বসে থাকলে কেবল মরণের কথাই তার মনে পড়ে। যে-জীবনে সে সুখ পেলে না, অপরকেও সুখী ক'রতে পারলে না; সে জীবন অনাবশ্যক। অনাবশ্যক যখন, তখন শুধু শুধু ভার বয়ে বেড়ানর মধ্যে কোন সুযুক্তি নেই। বেঁচে থেকে তার লাভ কি? অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক তর্কের পর সে এই কথার উত্তর পেলে মায়ের ঘরে কুলুঙ্গির ওপর থেকে। ডাক্তারবাবু কাল

সন্ধ্যায় মালিসের একটা ওষুধ দিয়ে গেছেন। শিশিটার গায়ে লাল অক্ষরে লেখা আছে 'বিষ'। সেই ছোট্ট দু'টি কথা তার চোখের সাম্নে জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বলে উঠল।

অলকাকে ঢুকতে দেখে মা জিজ্ঞেস ক'রলেন, কি মনে ক'রে বৌমা?

—কিছু ভাল লাগছে না মা। কুলুঙ্গি ঘেঁসে অলকা বসে পড়ল।

—এবার সব ভাল লাগবে মা। তোমার ছেলে হোক আগে।

অলকার সর্ব্ব শরীরে রোমাঞ্চের মৃদু শিহরণ দেখা দিলে।

—এখন থেকে মা এরকম মন ভার ক'রে বসে থেক না। প্রথম পোয়াতি—

মায়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অলকা বললে, বিনয় আমার কাছে লাটাই কেনবার জন্যে চার আনা পয়সা চেয়েছিল মা। কাছে ছিল না ব'লে দিতে পারিনি।

—তা' তুমি তখন আমার কাছে এলে না কেন মা? আমি তো দিন-রাত্তির-ই এখানে পড়ে থাকি। মা কোমর থেকে চাবিটা খুলে অলকার দিকে প্রসারিত ক'রে বললেন, এই নাও চাবি।

—ও আপনি-ই দেবেন।

—তুমি যখন বলছ, তখন না দিয়ে থাকতে পারি! আজই ইস্কুল থেকে ফিরে আসুক, তোমার সাম্নেই দোবখন।

অলকার আর মুহূর্ত্তের বিলম্ব সইল না। লুকিয়ে মালিশের শিশিটা শাড়ীতে ঢেকে সে উঠে পড়ল।

—এখুনি আবার কোথায় চললে বৌমা?

—ঘরে। ক'দিন ধরে ঘরটা এমন অগোছাল হ'য়ে পড়ে রয়েছে।

—নিখিকে বারবাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে এস। একা সব ক'রতে যেও না। প্রথম পোয়াতি: ভয় করে মা? কি ক'রতে গিয়ে কি হ'য়ে যাবে।

অলকার সব কথাগুলো পর্য্যন্ত শোনবার ধৈর্য্য ছিল না। নিজের ঘরে এসে ঢুকল।

অহীন্দ্রর আসবার কোন স্থিরতা নেই। এখুনি যদি এসে পড়ে। এসে যদি মালিশের শিশি এই ঘরে দেখতে পায়। বিনয়েন্দ্রর ইস্কুল থেকে আসবার সময় হ'য়ে গেছে। তাকে আজ লাটাই কিনে দেবার কথা আছে। সে যে দৌড়ে আসছে না; তা-ই বা কে বললে?

কোন কিছু আর না ভেবে অলকা তাড়াতাড়ি শিশিটা মুখের মধ্যে উপুড় ক'রে ধরলে। তারপর শিশিটাকে সজোরে জানলার বাইরে ফেলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ ক'রে উঠল। দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হ'য়ে এল। গলাটা ক্রমশঃ জ্বলে খাক্ হ'য়ে যেতে লাগল। শিরা উপশিরায় একটা বেদনাব আভাস উপলব্ধি হ'ল। শত চেষ্টা ক'রেও পাশ ফিরে শুতে পর্য্যন্ত সে পারলে না। সে বেশ বুঝতে পারলে, শরীর অবশ হ'য়ে আসছে। এই শুভ মুহূর্ত্তে সে যদি মুরারীকে একবার দেখতে পেত, কোন ক্ষোভ তার আর থাকত না। মা যদি তাকে জিজ্ঞেস করে মুরারী কেমন আছে? সে কি উত্তর দেবে?

অলকা স্থির হ'য়ে শুয়ে রইল সমুদ্রের বিক্ষব্ধতা অন্তরের অন্তরালে ঢেকে রেখে। এতদিনে তার বুকখানা ঠাণ্ডা হ'ল।

এমন সময় অহীন্দ্র মুরারীকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকে বললে, কে এঁসেছে, চেয়ে দেখ অলকা?

হয়তো তখন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। হয়তো তখন অলকা চোখ বুজিয়ে মৃত্যুর রূপ ধ্যান ক'রছিল।

অহীন্দ্র আগ্রহেব আতিশয্যে পুনরায় ডাকলে, অলকা, ওঠ, ওঠ—

স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় অলকা বলে উঠল, কে তুমি?

—আমি অলকা, আমি? মুবারীকে নিয়ে এসেছি তোমাকে বাঁচাব বলে।

অলকা স্তিমিত আঁখি উন্মীলন ক'রে দেখলে, বিছানার একপাশে মুরারী নিতান্ত শান্ত ছেলেটির মত বসে আছে। হাতে তার মাছ লেবেনঞ্চুস। শিথিল প্রায় হাত দু'খানা বাড়িয়ে নিজের বুকের মধ্যে তাকে চেপে ধরে সে চেঁচিয়ে উঠল, তুমি এখখুনি ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এস। আমি বিষ খেয়েছি।

অহীন্দ্র সেই মুহূর্ত্তে ছুটে বেরিয়ে গেল।

গত-বসন্ত

লোকে বলে : ভাড়াটে বাড়ী।

আমরা কিন্তু জানি, তার মধ্যে বাস করেন গৃহস্বামী নিজে। এত পয়সা ব্যয় ক'রে যদি সতেজ বাতাসই না মিললো, রোদের সংস্পর্শে শরীর ও মন উত্তপ্ত না রইলো, একটুখানি স্বচ্ছ আরাম না লাভ হ'লো বাড়ী করা কিসের জন্যে! এই যে উদয়-অস্ত পরিশ্রম—অনাগত বংশ-ধারাকে উচ্ছন্নে দেবার মধ্যেই কি এর সার্থকতা! সৌমেনবাবুর প্রকৃতি অন্য ধরণের। তাঁর ধারণা, জীবনকে পরিপূর্ণ উপভোগ করার নামই বেঁচে থাকা। করেনও অবশ্য তিনি তাই। সংসারে নিজে ও স্ত্রী মনোরমা ভিন্ন তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। তবুও সমস্ত দোতলা-তেতলাটা পুরোদস্তুর তাঁর অধিকারে। বাড়ীতে ভাড়াটে বসিয়ে আব্রু নষ্ট করবার পক্ষপাতিত্ব তাঁর মধ্যে কোনদিনই দেখা দেয় নি। কেনই বা তিনি তা' ক'রতে যাবেন? নিজে ইংরাজীর অধ্যাপক : লণ্ডনের পি-এইচ্-ডি। এর ওপর বাপ ঠাকুর্দ্দার স্বোপার্জ্জিতের একমাত্র উত্তরাধিকারী তিনি একা।

বিশ্বেশ্বর অবশ্য নীচের তলার একাংশে থাকে। এম্নি দয়া পরবশ হ'যে তিনি তাকে থাকতে দিয়েছেন। দয়াটা কিন্তু তার মুখ চেয়ে নয়, নিমাইবাবুর সৌজন্যে। আরতির তিনি শুধু গৃহশিক্ষক ছিলেন না। তার অভিভাবকের স্থানও দখল ক'রে নিয়েছিলেন। সৌমেনবাবু ভাগ্যবন্ত। সেই সময়ে নিমাইবাবুকে পেয়েছিলেন বলেই নির্ভাবনায় বিলেত যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হ'য়েছিলো। নইলে প্রতিপত্তির

সঙ্গে সঙ্গে এত সম্মান লাভ তাঁর ভাগ্যে জুটতো কিনা সন্দেহ। নিজে তিনি যা ক'রতে পারেন নি ; নিমাইবাবুকে দিয়ে তাই সম্ভব হ'য়েছে। নিজের মেয়েকেও কেউ অতখানি ভালবাসতে পারে না—অমন পরিপূর্ণ স্নেহ ঢেলে মানুষ ক'রতে সক্ষম হয় না। তাঁরই অনুরোধে বিশ্বেশ্বরকে তিনি থাকবার ঠাঁইটুকু দিয়েছেন। দিয়েছেন এই পর্য্যন্ত। কোন প্রকার দানপত্রও নেই : দাবী-দাওয়ার কোন প্রশ্নও উভয় পক্ষ থেকে ওঠবার সম্ভাবনা অহৈতুক। সেই থেকে বিশ্বেশ্বর রয়ে গেছে। সে কি আজকের কথা! নিমাইবাবুই আজ পাঁচ বছর হ'লো মারা গেছেন।

বিশ্বেশ্বরের প্রথমটায় ভাড়া দেবার সঙ্গতি ছিল না। অনুগ্রহের দানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায়ও তার মস্তিষ্কে আসেনি। কিন্তু ইদানীং ইস্কুলের মাষ্টারীটা পাবার পর থেকে তার আয়ের অঙ্ক বেশ কিছু বেড়ে গেলো। বেড়েই যখন গেলো, তখন কর্ত্তব্যজ্ঞানও তার প্রবল হ'য়ে উঠলো। অযাচিত দানের কথা নিজের পৌরুষকে পীড়া দিতে লাগলো—বিশেষ ক'রে করবীকে নিয়ে আসবার পর থেকে। একদিন সে সৌমেনবাবুর কাছে কথাটা পাড়লে : যতদিন উপায় ক'রতে পারিনি, ততদিন আপনার ভাড়া না নেওয়ার মধ্যে যুক্তি ছিল অসংখ্য। কিন্তু আজ যখন উপায় ক'রতে পারছি, তখন আপনাকে নিতেই হবে, যদিও জানি টাকা দিয়ে আপনার ঋণ আমি কোনদিনই শোধ ক'রতে পারবো না।

সৌমেনবাবু বললেন : যেখানে স্নেহ-ভালবাসার আদান-প্রদান, সেখানে ও জিনিষটা মূল্যহীন। ভবিষ্যতে ভাড়া পাবার প্রত্যাশায় তো আমি তোমায় থাকতে দিইনি। তোমার মনে আজ যে প্রশ্ন জেগেছে আমারো ঠিক সেই কথা মনে হয়। তোমার ওপর আমার জোর নেই বিশু, কিন্তু নিমাইবাবুর ওপর আমার জোর খাটতো।

সৌমেনবাবুকে আঘাত দিতে গেলে যখন বিশ্বেশ্বরের নিজের অন্তরই

কেঁদে ওঠে, তখন তার পক্ষে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথায় উঠে যাওয়া একেবারে অসম্ভব।

তবু পাশের বাড়ীর রণেন্দ্রর ধারণা : বিশ্বেশ্বর ভাড়া দেয়।

সৌমেনবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু বাণীকুমার বিশ্বাস ক'রতেই পারে না যে, এই বিংশ শতাব্দীতে এরূপ কৃতজ্ঞ কেউ থাকতে পারে!

মনোরমার মেজ ভগ্নীপতি পবিত্র বলেন: ট্যাক্স বাডবার ভয়ে সৌমেন কথাটা চেপে রেখেছে।

এঁরাই যখন বলতে পারেন, তখন পাড়ার আর পাঁচজনে কেনই বা চুপ ক'রে থাকবে? গলিটা যেখানে বেঁকে গিয়ে আনন্দ পালিত রোডের সঙ্গে মিশে গেছে, সেই মোড়ের মাথার লাল তিন-তলা বাড়ীখানার দিকে চেয়ে প্রতিবাসীরা সবাই বলে : ভাড়াটে বাড়ী। বলুক গে—

আমাদের গল্প তা'তে আটকাবে না।

ওপরের ঘর গুলোতে যখন সূর্য্যের অবাধ গতিবিধি চোখ রাঙিয়ে চলে যাচ্ছিলো এবং নীচেকার কোঠায় একটি জানলার ভিতর পাশের বাড়ীর মস্ত বড় বাঁকা ছায়া উঁকি দিতে সুরু ক'রছিলো—সেই শুভক্ষণে আমাদের গল্পের যবনিকা উঠলো।

যবনিকা উঠতেই দেখতে পাওয়া গেলো তিনতলার একটি ঘরে সৌমেনবাবু ইজিচেয়ারে শুয়ে 'প্যারাডাইস্ লষ্ট' আবৃত্তি ক'রে চলেছেন। মনোরমা রোদ্দুরের দিকে ভিজে চুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে সোয়েটারের গলা নিয়ে পড়েছেন। আর নীচেকার একটি ঘরে করবী ও বিশ্বেশ্বর পরম কৌতূহলে মুখোমুখি কাৎ হয়ে শুয়ে কথার জাল বুনে বুনে চলে যাচ্ছে।

বিরাম নেই : বিক্ষেপও নেই। প্রয়োজন নেই : তাগিদও নেই। তবু যেন কথা ফুরোতে চায় না।

সুনন্দা আর আসে না? তার বুঝি বিয়ের কথাবার্তা হ'চ্ছে? করবী পূর্ব্ব প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে জিগ্গেস করে।

বিয়ের কথা শুনি বটে।

তবে যে সেদিন সুনন্দা এসে ব'লে গেলো, ভাটপাড়া থেকে রায়েরা দেখতে আসবে।

কবে?

মনে নেই? এই তো সেদিন? 'বিদ্যুৎপর্ণা' দেখতে যাবার কথা হ'চ্ছিলো—

ওঃ! হ্যাঁ, হ্যাঁ—দেখতে এসেছিলেন বটে দু'টি ভদ্রলোক।

সুনন্দাকে নিশ্চয়ই পছন্দ হ'য়েছে তাঁদের?

একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে বিশ্বেশ্বর জবাব দেয়: ঠিক জানি না।

কিছু শোনো নি! করবীর কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

না।

সুনন্দা হয়তো লজ্জায় তোমায় বলেনি। অমন মেয়েকে আবার পছন্দ হবে না!

বিশ্বেশ্বর চুপ ক'রে থাকে।

সুনন্দার বিয়েতে কি দেবে ঠিক ক'রেছো?

তুমি-ই বলো না!

আমার ঘড়িটা দেখে সেদিন ও কি বলছিলো জানো? বাবাকে ঠিক এই রকম একটা ঘড়ি কিনে দিতে বলবো। তা—আমার মতন একটা ঘড়ি-ই দাও না।

বেশ, তাই দেওয়া যাবে।

অঘ্রাণ মাসেই হয়তো ওর বিয়ে হবে। মনে পড়ে, আমাদেরও অঘ্রাণ মাসে বিয়ে হ'য়েছিলো। সতেরোই।

বিশ্বেশ্বর একটুখানি হাসে। ম্রিয়মাণ হাসি।

ওর-ও যদি সতেরোই বিয়ে হয়, বেশ মজা হবে না ?

হুঁ। কিন্তু সুধীন্দ্রবাবুর ইচ্ছেটা ম্যাট্রিকের আগে মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

বিয়ে হ'লে বুঝি পড়া চলে না ? ও-সব বড়মানুষী চাল। সুযোগ্য পাত্র পেলে কেউ আবার ফেলে রাখে না কি ? মনীষাদি'র বেলায় দেখলে না ! ইন্দ্রনাথদা' অমন পাত্র এনে দিলেন।—না হয় লেখা-পড়াই তেমন শেখেনি, কিন্তু রোজগার কি তার কম ছিল ? মনীষাদি' নাক সিঁটকে বললে, ও মুখ্যু ছেলেকে বিয়ে ক'রবে না। না-ই বা ক'রলো। সে-ছেলের কি বিয়ে হ'লো না ? এখন ?…সেই বিয়ে নিয়ে জ্যেঠাবাবুর ঘুম হয় না।…

দরজায় খুট্ ক'রে আওয়াজ হ'লো। ঘরের মধ্যে ঝড়ও ঢুকতে পারে। মতির আসাটাও বিচিত্র নয়। মনোরমা যে আসবেন, এটা কা'রো অভিপ্রেত নয়। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তবু করবীকে উঠতে হ'লো : ঘোমটার আয়তন বাড়িয়ে দিয়ে তবু তাকে ঘরের বাইরে যেতে হ'লো।

সিঁড়ির গোড়ায় মনোরমার চাপাকণ্ঠ শোনা গেলো : আজ বুঝি তাই ওপরে ওঠনি !

না মাসীমা, শরীরটা আজ ভাল নয়।

মনোরমা দ্বিরুক্তি না ক'রে ওপরে চলে গেলেন। করবী এলো না বলে তাঁর এতটুকুও দুঃখ্ নেই। মানুষ স্বার্থের কাছে কত নীচ—এর প্রমাণ তিনি জীবনে বহুবার পেয়েছেন। আরতির ওপর তাঁর জোর আছে, নিজের মেয়ে ব'লে দাবী করা চলে—সে-ই বড তাঁর মুখ চায় ? তবু করবী যেটুকু সম্মান দেখায়, যতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ; সেটুকুও তাঁর প্রাপ্য নয়। এই কারণেই ঐ সর্ব্বংসহা নারীটির প্রতি মনোরমার স্নেহের অন্ত ছিল না। সারাদিনের মধ্যে

অমন কতবার যে তিনি নীচে ছুটে এসেছেন, তার ইয়ত্তা নেই আহা-হা, সংসারে ওর কেউ নেই। ও যদি বলেই থাকে; শরীরটা আজ তেমন ভাল নয় মাসীমা। আমি যাব না। এর জন্যে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। বরং ওর একনিষ্ঠতাকে প্রশংসা ক'রতে ইচ্ছে যায়। ওর অন্তরের আলোড়ন কোথায় এবং কোনখানে তার পরিসমাপ্তি —এ কথা মনোরমা বিশেষ ক'রেই জানেন। এক সময়ে তাঁরও করবীর বয়েস ছিল। তিনি একদিনে আরতির মা হ'তে পারেন নি।

সন্ধ্যেবেলায় মনোরমা ফের এলেন। নিজেকে কিছুতেই তিনি সংযত ক'রে রাখতে পারলেন না। টুকরো প্রশ্ন ও পরিপূর্ণ সমবেদনা জানিয়ে তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

মাসীমার অকৃত্রিম ভালবাসাম পরিচয় করবীকে ব্যথিত ক'রলে। ছোট্ট গণ্ডীর ক্ষুদ্রতর পরিধির ভিতর তার বিবাহিত জীবনের উৎসব আয়োজন। একঘেয়ে জীবনযাত্রার পুনরাবৃত্তির মধ্যেই তার আশা ও আকাঙ্ক্ষার দীপারতি। সেই সকাল আর সেই রাত্রি—মাঝখানে দুরন্ত ব্যবধান। তারও বটে: তার মনেরও বটে। সেই সময়টিতে সে বৈচিত্র্যের সন্ধান পায় মাসীমার সাহচর্য্য লাভ ক'রে। একাকীত্বকে নির্জ্জনতার মাঝখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেকে মুখরা ক'রে তোলা মাসীমার প্রাত্যহিক জীবনের প্রধান অঙ্গ। জাপানে গিয়ে তিনি কোথায় কি ভাবে অপ্রস্তুত হ'য়েছিলেন; কাশ্মীরে আসন্ন-মৃত্যুর হাত থেকে কেমন ক'রে অব্যাহতি পেয়েছিলেন; তাজমহল দেখতে গিয়ে ডাকাতের দলের মধ্যে কি রকম ক'রে গিয়ে পড়েছিলেন।··· এমনিধারা মৃত-ইতিহাসের কত মরা কাহিনীর সন্ধান তিনি প্রত্যহ দিতেন। করবী তন্ময় হ'য়ে তাই শুনতো। শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতসারে সে সীমানার বাইরে চলে যেতো। তার মনে জেগে উঠতো বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রেরণা। আগ্রা, কাশ্মীর,

জাপান—এরা পৃথিবীর মধ্যে। এদের সঙ্গে পরিচিত হবার অধিকার তারও আছে। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে সে একটানা তিনটি বছর এখানে কাটিয়ে দিয়েছে। তাজমহলের রূপ, চেনার-বাগের সুষমা, চেরীকুঞ্জের অপরূপতা তার মনকে কেড়ে নিয়ে যেতো। কখন কোন ফাঁকে নির্দ্দিষ্ট ক্ষণের সমাগম তার হৃদয় সোণালী আলোয় রাঙিয়ে দিয়ে চলে যেতো—সে জানতে পারতো না। যখন পারতো গল্পের মাদকতা, অনাস্বাদিত জগতের অভিনব আকর্ষণ ওপরেই পড়ে থাকতো। নীচেকার ঘরের পর্দ্দার শীর্ণদেহ ভেদ ক'রে দৃষ্টি-প্রদীপের অনির্ব্বাণ শিখা জ্বলে উঠতো। অল্পক্ষণের মধ্যেই বিশ্বেশ্বর এসে পড়তো। সঙ্গে সঙ্গে নিঃসাড় নিস্তব্ধ বাড়ীখানার একটি ভগ্নাংশ মৃদু গুঞ্জরণে চঞ্চল হ'য়ে উঠতো।

সুদীর্ঘ তিন বছরের ইতিহাসে আজ যে-ব্যতিক্রমের প্রথম রেখাপাত পড়লো, সেটুকু করবী কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না। কতবার তার মন খেই হারিয়ে ফেলেছে মামীমার বিচিত্র কাহিনীর অপূর্ব্ব লীলাভঙ্গী শোনবার জন্যে; কিন্তু কোনোক্রমেই সে স্বামীর সঙ্গ পরিত্যাগ ক'রতে পারে নি। প্রতিদিনের অনাবশ্যক প্রশ্ন ও অর্থহীন অনুযোগ জানানো ছাড়া করবীর নতুন কিছু চাইবার ছিল না; বিশেষ কিছু আবেদন জানাবার ছিল না। তবু সে যেতে পারে নি। যে-নারীটিকে সে মায়ের চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা করে; যাঁকে সে মনে মনে পূজা ক'রে—নিতান্ত তুচ্ছ অজুহাতে তাঁর স্নেহের আহ্বানকে সে অক্লেশে অবহেলা ক'বলে। একটুও দ্বিধাবোধ করেনি; এতটুকুও ব্যথা লাগেনি তার অন্তরে। পরম কৌতূহলে সামনাসামনি বসে সে জগৎকে লুকিয়ে রেখেছিলো ঐ একটি ঘরের মধ্যে। তাই ওর সকল সঙ্কল্প আজ এমনি ভাবে লুটিয়ে পড়েছে। যে-ক্ষুণ্ণতার সে নিজে—সেই অপূর্ণতাই তাকে বেশী ক'রে ক্ষুভিত ক'রলে।

কেন সে ওই বর্ষীয়সীর অশ্রান্ত বাসনাকে একটি কথার আঘাতে ভেঙে দিলে!

কবরী বাঁধতে বাঁধতে অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো। দু'জনের সংসারে রান্নার ব্যস্ত আয়োজন নেই—প্রচুর সমারোহও থাকে না। তবু তাকে এই সময়টিতে সারাক্ষণ রান্নাঘরে বন্দী থাকতে হয়। বিশ্বেশ্বরের আসবাব কিছু ঠিক নেই। এ তো আর আফিসের চাকরী নয় যে মেপে খেটে আসতে হবে। তা ছাড়া বড়লোকের মেয়ে সুনন্দা। তার খেয়াল-খুশীর অভাব নেই। সে সিনেমায় যেতে পারে, মাথা ভার হ'লে সুনীতিদের বাড়ী ঘুরে আসতে পারে, পড়াতে মন না বসলে অর্গানে গিয়ে বসতে পারে, কিছু ভালো না লাগলে এমনি অকারণ মোটারের তেল পুড়িয়ে বাড়ী ফিরতে পারে। তার মর্জ্জির ওপর হাত দেবার ক্ষমতা কারুর নেই। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে সুধীন্দ্রবাবুও বড় একটা সংসারের কথায় থাকেন না; সুনন্দারও পিসিমার কথার ভার সয় না। তিনি সেকেলে লোক। এ কালের রীতি-নীতি বরদাস্ত ক'রতে মোটেই তিনি অভ্যস্ত নন। তাই মাঝে মাঝে যখন সুনন্দার কার্য্য-কলাপে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেন তখন ছোট ভাইটিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেন: তুই কি কিছুই দেখবি না সুধী? আমি বাপু আর এ-সংসারে থাকবো না। তুই আমাকে কাশী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। মেয়ের অনাসৃষ্টি যেন দিন দিন ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। হাজার হোক্, সমত্ত বয়েস—এখন কি আর মাষ্টারের সঙ্গে অতোখানি হাসি-তামাসা শোভা পায়!

সুধীন্দ্রবাবু বলেন: বিশ্বেশ্বর তো তেমন ছেলে নয়! সৌমেন ওর কত সুখ্যাতি করে।

পিসিমা বলেন: যে করে করুক্ গে! ওর বেহায়াপনা দেখে দেখে হাড় কালি হ'য়ে গেলো। পরশু দিন—জানিস সুধী—ঘরে ঢুকে

দেখি তোর আদুরে মেয়ে মাষ্টারের গলা জড়িয়ে ধরে বলছে, চলো না মাষ্টার মশাই—কি বাপু ইংরিজি কথা উচ্চারণ ক'রলে বুঝতে পারলুম না। তার খানিক বাদেই মেয়ে এসে জানিয়ে গেলো, পিসিমা, আমি বায়োস্কোপে চললুম। বাবাকে ভাবতে বারণ ক'রে দিয়ো। আস্পর্দ্ধা দেখ দেখি। ওসব মেয়ের নোড়া দিয়ে মুখ থেঁতো ক'রে দিতে হয়। তুইও তো কিছু দেখবি না। দিব্যি হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছিস। এদিকে মেয়ের জন্যে যে আমার সকলের কাছে মুখ বার করা দায় হ'য়ে উঠলো।

সুধীন্দ্রবাবু বলেন: আজকালকার মেয়েরা ঐরকমই দিদি। ওদের কি কিছু বলবার যো আছে! নবেন্দুর বড় মেয়ে কি ক'রলে!

পিসিমা বলেন: না, তা'বলে বলবে না। অন্যায় ক'রলে বাপ-মা কিছু বলতে পারবে না। আর ওর যা-ইচ্ছে তাই ক'রবে। তুই ছেড়ে দে সুধী ওর কথা। অমন পাত্র যেচে যখন এসেছে, তখন কোনমতেই হাতছাড়া ক'রিস নি। বিয়ে যখন দিতেই হ'বে খামকা ধিঙ্গি ক'রেই বা কি লাভ? সামনের রোববার ভাটপাড়ায় গিয়ে তুই এদিকের সব পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে আয়, যাতে অঘ্রাণেই ও ঝঞ্ঝাট চুকে যায়। আমি বলছি, আমার কথা শোন সুধী। তুইও নিশ্চিন্দি হোস্—আমিও রেহাই পাই। লোকের কথা শুনতে আর পারি না। সেদিন পালেদের বড় বৌ বেড়াতে এসে কত কথা শুনিয়ে দিয়ে গেলো।

সুধীন্দ্রবাবু বলেন: সুনন্দার মা নেই বলে কোনদিন তাকে কিছু বলিনি দিদি, পাছে সে মনে ব্যথা পায়।

পিসিমা বলেন: মেয়ে কি সেই যুতের, যে চোখ টিপলে বুঝতে পারবে! নইলে করুক না লেখাপড়া। সে তো বংশেরই গৌরব। পাঁচটা নয়, সাতটা নয়—তখন কে আর জোর ক'রে বিদেয় ক'রে দিতে চায়? সাধে কি দেয়? নিজেদেরও তো মান বাঁচাতে হবে।

সুধীন্দ্রবাবু বলেন: আমি ভাবতেই পারিনি যে সুনন্দা আমার মেয়ে হ'য়ে আমাকে এমনি ক'রে অপদস্থ ক'রতে সাহসী হবে। পৃথিবীর সবাই অকৃতজ্ঞ। নইলে সুনন্দা যখন যা বলেছে, তাতেই সম্মত হ'য়েছি। কোনদিন ওর আবদারের এতটুকু ত্রুটি রাখিনি। মরবার সময় ওর মা'র কাছে শপথ ক'রেছিলুস দিদি, সুনন্দাকে কিছু বলবো না। তাই।...তা না হ'লে আজ-ই সুনন্দাকে জানিতে দিতে পারতুম, শাসন ক'রতে জানি কি না!

পিসিমা বলেন: শুধু শুধু বকেই বা কি হবে? তার চেয়ে এক কাজ কর। ইস্কুল-ফিস্কুল ছাড়িয়ে দে—লেখাপড়ায় আর দরকার নেই।

সুধীন্দ্রবাবু বলেন: সেই ভাল দিদি, বিশ্বেশ্বরকে কাল থেকে আসতে নিষেধ ক'রে দেবো!

পিসিমা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে অন্তর্হিত হ'য়ে গেলেন।

সুধীন্দ্রবাবু আজ আর কোথাও বেরোলেন না। সুনন্দা যতক্ষণ না ফিরে আসে, তিনি এখান থেকে নড়বেন না।

সাতটা বাজলো, আটটা বাজলো; ন'টাও বেজে গেলো তবু সুনন্দার আবির্ভাবের সময় হ'লো না।

দশটাও বাজলো।

স্বামীর প্রতীক্ষায় বসে বসে অধৈর্য্য হ'য়ে মনোরমা যখন বেতের চেয়ারে পুরাণো মাসিকের পুরাণো গল্পে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে দিয়েছিলেন, সেই সময় সৌমেনবাবুরই আসা উচিৎ ছিল। কিন্তু সৌমেনবাবু এলেন না। এলো করবী।

ওমা তুমি! বিশু বুঝি এখনো পড়িয়ে ফেরেনি? দেখ দেখি ছেলের আক্কেলখানা!

মনেরও অন্তরালবর্তিনী যে কথা জানবার জন্যে করবী এসেছিলো, বৈপরীত্য আবহাওয়ায় তার মুখ দিয়ে একটিও কথা ফুটলো না।

যদি একটুও বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকে বিশুর। এখনো ছেলেমানুষী স্বভাব তার গেলো না। ভ্রূক্ষেপও নেই যে বাড়ীতে বৌ তার হা-পিত্তেস ক'রে বসে আছে। আশ্চর্য্য ছেলে যা-হোক্। এই বড় কোলকাতা শহরে মেয়ে যেন ও ছাড়া আর কেউ পড়ায় না! শেষের কথাগুলো বলবার সময় তিনি যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের ইঙ্গিত ক'রলেন তা' বুঝতে করবীর একটুও বিলম্ব হ'লো না।

করবীর পালিয়ে যাবার কথাই মনে হ'চ্ছিলো। কেন সে ওপরে এলো? ওপরের সঙ্গে তার সম্বন্ধই বা কিসের? এই বাড়ীতে থাকে বলেই তো সে আজ নিঃসঙ্কোচে ওপরে উঠতে পেরেছে: আত্মীয়তার স্বল্প সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়ে তার প্রার্থনা জানাবার যোগ্যতর ব্যক্তি মনে ক'রেই তো তার আসা। নইলে সে কি জানে না যে মাসীমা তারই মতো নিরুপায়। সমবেদনা ছাড়া অন্য কিছু জানাবার ভাষা তাঁর জানা নেই। তবু সে অপরাধিনীর ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলো।

বসো। তুমি যেন মা দিন দিন পর হ'য়ে যাচ্ছো!

করবী বসলো। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে না বসে থাকতে পারলে না। যে কথা বলবার জন্যে সে এসেছে, সে কথা অন্তরে চেপে রেখে সে একটা মিনিটও স্বস্তিতে কাটাতে পারবে না জেনেও নীরব হ'য়ে রইলো।

মনোরমা কথার জের টেনে চললেন। পুরুষের বিরুদ্ধে নিজের ব্যক্তিগত বহুদর্শিতার কাহিনী বেশ গুছিয়ে বলে যেতে লাগলেন।

করবী কতক শুনলে: কতক শুনলে না।

উপসংহারে এসে মনোরমা বললেন: নিজেকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে না পারলে সুখ পাওয়া যায় না মা নিজে কঠিন হ'তে

পেরেছিলুম বলেই আজ আমার কোন দুঃখু নেই। তোমাকে নিজের মেয়ের মতন দেখি বলেই এত কথা বললুম। নইলে কে কার্ জন্যে ভাবে ?

করবীর উত্তেজনা তবু মরলো না। জীবনের সব চেয়ে বড সঞ্চয়টিকে হারিয়ে ফেলার ইঙ্গিত তাকে অস্থির ক'রে তুলেছে। অসহিষ্ণু মন নিয়ে সে আর এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে বিচরণ ক'রতে পারবে না। সে এইবার মরবে। মরবেই সে। সে মরে ক্ষতি নেই। কিন্তু স্বামীর কোলে মাথা রেখে দিয়ে সে মরতে পারবে না। এইটুকু ভেবে সে ব্যথিত হ'লো।

মনোরমাও উদ্বেগশূন্য ছিলেন না। সৌমেনবাবু মোটার নিয়ে কখন বেরিয়েছেন, এখনো দেখা নেই। দুর্ভাবনার কালো মেঘ তাঁর অন্তর ছেয়ে ফেলেছে। রাগের মাথায় অনেক কিছু বলে ফেলে শেষকালে করবীর মন ভিজিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে যখন তিনি সুর বদলে ফেললেন, তখন দেখা গেল করবী কাঁদতে সুরু ক'রে দিয়েছে।

ছিঃ মা, কাঁদতে নেই। কেঁদে কেউ কোনদিন সুখ পায়নি। বিশু এলে আমি তাকে বকে দেবোখন, যাতে না আর দেরী ক'রে ফেরে।

করবী খুব স্বাভাবিক গলায় বললে ঃ সে আর আসবে না মাসীমা।

আসবে না ? কেন ? একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন যেন মনোরমা।

এত দুঃখের মাঝেও করবীর হাসি এলো। ম্লান হেসে বললে ঃ আমাকে দরকার নেই তাই আর আসবে না। না আসুক তা'তে আমার ক্ষতি নেই মাসীমা। কিন্তু আপনাকে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। আমাকে আমার মার কাছে পাঠিয়ে দেবার ভার আপনাকে নিতে হবে।

তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না যে—

এই চিঠিখানা পড়লেই বুঝতে পারবেন। তা'ছাড়া মতিকে খুঁজতে পাঠিয়েছিলুম সুনন্দাদের বাড়ী। সে-ও শুনে এলো সুনন্দা বায়োস্কোপ যাবার নাম ক'রে দুপুরে কোথায় বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি।

মনোরমার চিঠি পড়বার আগ্রহ রইলো না। শরীর শ্লথ হ'য়ে এলো। ভগ্ন কণ্ঠে বললেন: আমাদের নিমাইবাবুর ছেলে বিশু কোনদিন এমন কাজ ক'রতে পারবে, এ আমি এখনো বিশ্বাস ক'রতে পারছি না মা।

হ্যাঁ মাসীমা, সে চলে গেছে। আমি জানতুম একদিন সে চলে যাবেই। তবু বাধা দিইনি। সুখী ক'রতে যাকে পারলুম না, তাকে দুঃখু দেবার অধিকার নেই ভেবে। আজ আমার কোন ক্ষোভই থাকতো না, যদি সে কাপুরুষের ন্যায় সুনন্দাকে নিয়ে পালিয়ে না যেতো। সে জানতো মাসীমা যে আমার বেঁচে থাকাটা ওদের মিলনের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে, জেনেও সে আমাকে মেরে ফেলেনি কেন? তাহ'লে তাকেও কলঙ্কের রাশি নিয়ে বেঁচে থাকতে হ'তো না—আমিও শান্তিতে মরতে পারতুম।

একটা অস্ফুট দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। মনোরমা বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে রইলেন।

অনেক ভেবেছি মাসীমা। ভেবে দেখেছি আমার আর অন্য পথ নেই এখান থেকে চলে যাওয়া ছাড়া। আমি থাকতে তারা সুখী হ'তে পারবে না। আমাকে যেতেই হবে মাসীমা। জানি, আপনি আমায় ধরে রাখবার চেষ্টা ক'রবেন। আরতির স্থানে আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে চাইবেন। তবু মাসীমা, আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। আমারো কি দুঃখু হ'চ্ছে না এই স্বর্গ ছেড়ে চলে যেতে!

না মা, তোমার যাওয়া হ'তে পারে না। আমি আবার বিশুকে তোমার কাছে এনে দেবো। আমি বলছি রুবি, আমার কথা শোনো।

যে-শ্রদ্ধা সে এতদিন আমার কাছে পেয়ে এসেছে, সে-শ্রদ্ধা যদি তাকে আর দিতে না পারি, তখন যে আপশোষ রাখবার আমার আর জায়গা থাকবে না মাসীমা। কাজ নেই মাসীমা, আমাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। এই দুঃখের দিনে আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই, যে আমার ব্যথা বুঝবে; যে আমাকে সাহস দেবে? স্বামীর জন্যে যদি মরি, তা'তেই বা দুঃখ কি? তাই বা ক'টা লোকে পারে? কথার শেষে করবী প্রাণপণ হাসবার চেষ্টা ক'রলে; কিন্তু বিফল-মনোরথ হ'য়ে সে চেয়ারের হাতলে মাথাটা নুইয়ে দিলে।

করবীকে বিরত করবার হাজার প্রলোভন এক নিমিষে কে যেন কেড়ে নিলে। মনোরমা সস্নেহে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন: তাই হবে মা; তোমাকে কাল ভোরেই রাধাকান্তপুরে পৌছে দিয়ে আসবো।

হাসি কান্নায় করবীর মুখখানা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। মনোরমাকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা কি ভাবে জানাবে তার ভাষা খুঁজে না পেয়ে সে ছটফট ক'রছিলো।

এমন সময় সিঁড়ির আলো জ্বলে উঠলো। সৌমেনবাবু আসছেন। মনোরমা নড়তে পর্য্যন্ত পারলেন না। করবী লজ্জায় নীচে পালিয়ে গেলো। পরিপূর্ণ স্নেহের স্পর্শ পেয়ে তার মন অনেকখানি গলে এলো। মাসীমার যে সকল কথা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তার প্রলাপ বলেই মনে হ'য়েছিলো, তারাই যেন এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান ক'রে দিলে। সত্যিই তো, মাসীমা তার চেয়ে বয়েসেও বড়: অভিজ্ঞতাও বেশী। তাঁর কথার যথেষ্ট মূল্য আছে। তিনি সংসারকে যত বেশী

চিনতে পেরেছেন ; সংসারে যত বেশী আঘাত পেয়েছেন—করবী তার কতটুকুই বা জানতে পেরেছে ?

একা-ঘরে আলো জ্বালিয়ে করবী চুপ ক'রে বসে রইলো। মনোরমার উচ্চারিত কথাগুলোই তাকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তিনি ঠিকই বলেছেন : পৃথিবীতে কেউ কারুর জন্যে ভাবে না। সবাই স্বার্থপর : সবাই হীন। যাকে সুখী ক'রবে ভেবে করবী সর্ব্বস্ব হারালে, সেই বিশ্বেশ্বর যে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বংসহা নারীটির আপ্রাণ পরিকল্পনা এক নিমিষে ধূলিলুণ্ঠিত ক'রে দেবে, এ কথা পৃথিবীর কেউ জানতে পারেনি। করবী এখনো বিশ্বাস ক'রতে পারছে না যে সুনন্দা—সেই সুনন্দা, যাকে স্নেহে ভালবাসায়, মায়ায়-মমতায় একেবারে নিজের ক'রে নিয়েছিলো—এতখানি নীচ হ'তে পারে সে ! মানুষকে চেনা যায় না তার বাইরের আবরণ দেখে। তার এখন কান্না পাচ্ছে, কেন সে-ও পৃথিবীর সকলের মত একজন হ'তে পারেনি। কঠোর নিষ্ঠুরতা দিয়ে সুনন্দার অন্তরালবর্ত্তী মৌন আকাঙ্ক্ষাকে ভেঙে তচনচ ক'রে দেয়নি ? তাহ'লে তো তাকে আজ এম্নিভাবে কাঁদতে হ'তো না। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার সামীপ্যে এসে একটুকুরো আলোর জন্যে কঠিন সাধ্য-সাধনা ক'রতে হ'তো না !

রাত ফুরিয়ে এলো।

আবার সূর্য্য উঠবে। আবার সূর্য্য ডুবে যাবে। রোজ আসবে যাবে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী। তবু এই যাওয়ার মধ্যে কত বৈচিত্র্য ; কত অপরূপতা। চলার পথে অতীত দিগন্তে মিশে যাবে ; বর্ত্তমান অনুজ্জ্বল হ'য়ে পড়বে। উদয়-অস্তের একাগ্রতা চোখ ঝলসে দেবে, মন রাঙিয়ে দেবে, জীবন বহুদর্শী ক'রে তুলবে। এই গতিশীলতার একটানা প্রবাহের মধ্যেই

মানুষের জীবন। জীবনের স্ফুরণ: জীবনের ম্লানিমা। জীবন অর্থহীন: মৃত্যু অনাবশ্যক। সৃষ্টি-রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাং... চোখ দু'টো যখন ঘোলাটে হ'য়ে আসবে, যখন অনৈসর্গিক ... অনাবিষ্কৃত সুন্দরকে প্রতিনিয়ত অনাগত প্রভাতীর উদ্দাম আড়ম্বর স্মরণ ক'রিয়ে দেবে, তখন বাস্তবের সংস্পর্শে কল্পনীয় সোণালী রঙ ধুয়ে মুছে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। ইহাই নিয়ম: জাগতিক ইতিহাসের এই নির্দ্দেশ একান্ত আনুষঙ্গিক।

করবী ভাবছিলো। ··

দীর্ঘ রাত্রির প্রশান্তিতার মধ্যে করবী ভাবছিলো, একদিন তার জীবনে যে বসন্ত-উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছিলো, আজ যাত্রার প্রারম্ভে কোথায় গেল তার রূপ, রস, গন্ধ?

অকৃতজ্ঞ পৃথিবী

অশোকের ছাত্র-জীবনের সে-সুনাম আর অক্ষুণ্ণ রইল না এম-এ দেবার সময়। উপর্য্যুপরি দু'বার অকৃতকার্য্য হ'য়ে সে একেবারে মুষড়ে পড়ল। তা মুষড়ে পড়বারই কথা। প্রথমবার না-পারার তবু কারণ ছিল। বাবার অসুখের দরুণ পড়াশুনায় সে তেমন মনোযোগ দিতে পারেনি। শেষের দামী তিন তিনটে মাস বই না ছুঁয়ে রোগীর পাশেই তাকে কাটাতে হ'য়েছে। তবু তার আশা ছিল হয়তো একটা থার্ড ক্লাশও লেগে যেতে পারে। তাই প্রথমবারের না পারার জন্যে তার তেমন কোন ক্ষোভ নেই। সে তো জেনেশুনেই অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়েছিল অনর্থক একটা বছর ক্ষতি ক'রতে তার মন চাইনি বলে। কিন্তু দ্বিতীয়বার যে-আশাতে সে বুক বেঁধেছিল তার ফলাফল হ'ল যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি মর্ম্মান্তিক। আবার তাকে পড়তে হবে। এবারে না হয় তার পরিত্রাণ মিলবে, কিন্তু সংসার তাকে নিষ্কৃতি দেবে কেন? সংসারের সমস্ত ঝক্কি এবার থেকে তাকেই বইতে হবে: পৃথিবীর প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি বিষয় তাকে সুতীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য ক'রতে হবে। এখন শুধু বই নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না: ভেসে-যাওয়া লঘু মেঘের মতো উড়ে যাওয়া আর হবে না। পৃথিবীকে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় বাঁধতে হবে। সমস্তই তাকে বুঝে-পড়ে নিতে হবে। নিরর্থক পরীক্ষা দিয়ে খামকা সে আর তাই টাকা নষ্ট ক'রতে চায় না। সামান্য পুঁজি—যদি এগজামিনের ফি গুণতে গুণতে-ই নিঃশেষ হ'য়ে যায় তবে সে খাবে কি? বাড়ীখানার ইটগুলো গুঁড়ো

ক'রে তো আর পেট ভরবে না। সামে তার পড়ে রয়েছে অনন্ত পথ ; তাকে যে এ পথ শেষ ক'রতেই হবে—তা সে যেমন ক'রেই হোক না কেন ? তাকে চলতেই হবে—হ'লই বা সে অবিশ্রান্ত, পরাজিত। এই কর্ম্মময়জগতে বিরতির স্থান নেই। হয়তো একলা হ'লে তার কিছু সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু সঙ্গে রয়েছে তার মা—যাঁর ফুরিয়ে গেছে পথ চলার আনন্দ। ক্লান্তি আর অবসন্নতা ঘনিয়ে এসেছে যাঁর মনের দুয়ারে : পথ-শেষের স্বপ্নময়ী তন্দ্রা এসে ধরা দিয়েছে যাঁর চোখের পাতায়। আর ক'টা দিনই বা তিনি এই চন্দ্র-সূর্য্য, এই এক-আকাশ-তারা-ভরা আকাশের নীচে বিচরণ ক'রতে সমর্থ হবেন। নেতিয়ে পড়েছেন ঝড় আর ঝঞ্ঝার দাপটে ; মন ভরে গেছে অবসাদের ক্ষুণ্ণতায়। তাঁকে পেছিয়ে ফেলে অশোক তো এগিয়ে যেতে পাবে না। তাঁকে নিরুৎসাহে ভরিয়ে তোলা, পঙ্গুর মতো তাঁকে একেবারে অপদার্থ ক'রে ফেলা শিক্ষিত অশোকের প্রাণে বাজে। মায়ের সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে সে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক ক'রতে পারলে না। তাই সে যখন তার অসহায়তার কথা মাকে জানালে, তিনি দুঃখু ক'রে বললেন, তবু তুই পড় অশোক। উনি থাকলে কি তোর পড়া আটকাত। যে কোন উপায়ে তিনি তোকে পড়াতেন-ই।

পড়া ! পুরাণো যে-বইগুলো এতদিন তাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে মেরেছে, পৃথিবীতে এখনো তার কর্ত্তব্য হচ্ছে শুধু সেই বইগুলোর মধ্যে ডুবে থাকা ! সেই পরিমিত পৃথিবীর পরিধিতে নিজেকে দিবারাত্র বন্দী ক'রে রাখা ! পড়াশুনা তার দ্বারা আর হবে না। যে-মন নিয়ে সে পৃথিবীতে এসেছিল, সে-মনের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে তো এরাই ? এরাই তো তার জীবনের আলো কেড়ে নিয়েছে : সবিপুল সাধনার একাগ্রতার বিরতি ঘটিয়েছে। এতদিন কোনদিকে তাকাবার তার অবকাশ ছিল না। চিন্তা করবার তার কখনো সময় আসেনি। কালো

কালো অক্ষরগুলোর সঙ্গেই ছিল তার পরম অন্তরঙ্গতা, যার ব্যতিক্রম হ'তে দেওয়াটা মনে হ'ত তার নিজের কাছেই একটা ব্যভিচারের মতন। কিন্তু সেদিনের প্রয়োজন তো শেষ হ'য়ে গেছে! সে আর এ নিয়ে ভাববে না। তাকে বেঁচে থাকতে হবে: তাকে অর্থ উপার্জ্জন করবার পন্থা খুঁজে বার ক'রতে হবে। যেটুকু স্বাধীন সত্ত্বা এখনো তার নিজের বলতে অবশিষ্ট আছে, সবটুকুই নিঃশেষে ফুরিয়ে যাবে অক্ষরগুলোর উপর আবার আধিপত্য বিস্তার ক'রতে ক'রতে। সে-গুলোকে এবার সে মুক্তি দেবে: মোটা মোটা কেতাবের মধ্যে পুরে আর তাদের বন্দী ক'রে রেখে দেবে না। অগ্নি সংকারে সে তাদের স্বর্গের দ্বারে পৌঁছানর ব্যবস্থা ক'রবে। ধৈর্য্যের বাঁধ তার ভেঙ্গে গেছে। জয়ী হবার সঙ্কল্প সে পরিত্যাগ ক'রেছে। নিয়তির নির্ম্মম আঘাতের পরও উঁচু হ'য়ে চলবার যে অনমনীয় সাহস আর দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা তার অন্তরে জেগেছে তাকে আর সে হত্যা ক'রবে না। এবার সে বাঁচবে—বাঁচবার স্বাধিকারে।

আভাসে মাকে কথাটা বলতে তিনি কান্নাকাটি সুরু ক'রে দিলেন। অশোকই তাঁর একমাত্র আকর্ষণ। সে-ও যে একটি আঘাতের ভারে এমনিভাবে নুয়ে পড়বে তা ছিল তাঁর কল্পনার নাগালের বাইরে। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তবু তুই আর একবার চেষ্টা কর বাবা। তাঁর বড় সাধ ছিল তোকে এম-এ পাশ করানর।

অশোক বললে এখন থেকে চাকরি বাকরির চেষ্টা না ক'রলে আর ক'দিনই বা চলবে এই সামান্য ক'টা টাকায়?

মা বললেন, যে ক'দিনই চলুক। তবু তুই হাল ছাড়িসনি। হ'লই বা তোর পরাজয়; মানুষের জীবন তো শুধু জয়-পরাজয় নিয়ে নয়। পরাজয়ের মধ্যেই তুই একদিন অপরাজিত হ'য়ে উঠবি। আবার বুক বেঁধে লেগে যা। মা'র আশীর্ব্বাদ বিফলে যাবে না।

অশোকের চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হ'ল, সবই অকৃতজ্ঞ মা—এই পৃথিবী, এই মানবতার জনসমুদ্র, এখানকার যত সব পাষাণ দিয়ে গড়া মূর্ত্তি ;— ওপরের ওই দেবতা, ওই তারার মালা, ওই বজ্র-বিদ্যুৎ-ভরা আকাশ, সবই অকৃতজ্ঞ। মানুষ কি আর সাধে পালায়! এদের সকলের জ্বালাতনে অস্থির হ'য়ে ওঠে। পারে না নরম মাটির মতোন, লম্বা গাছের মতো, গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালার ন্যায় চুপ ক'রে মুখ বুজিয়ে থাকতে। কিন্তু মায়ের অসহায় চোখ দু'টির পানে তাকিয়ে সে শুধু বললে, তুমি আর কেঁদ না মা, আমি আবার পড়ব।

পলকে এমনি ক'রেই প্রলয় হয়। অশোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার মাথায় পড়ল বজ্র। নতুন জগতে তার প্রবেশ অধিকার নিষেধ। পরিচিত পথেই তাকে যাত্রা সুরু ক'রতে হবে। যে-পথে নেই কোন কৌতূহল ঃ যার জন্যে বিশেষ সে উদ্‌গ্রীবও নয়। তবুও যা হবার নয়, তাই আজ থেকে সে ক'রবে। মরণকে ফাঁকি দেওয়া চলে না নেহাৎ ; নইলে হয়তো সে তা-ও ক'রত। জিততে গিয়ে প্রতিদিন তার হার হ'চ্ছে। তার ওপর পথ চলতে সে একা—দোসর কেউ নেই। মা, তিনি শুধু একটা উপলক্ষ্য। সে না পাবে তাঁর নিকটে ক্ষণিক উৎস, না পাবে দীপ্যমান কান্তি। নিজের পথ চলা দুরূহ হ'য়ে উঠেছে, পরকে সাহায্য ক'রতে যাওয়া তাঁর পক্ষে ধৃষ্টতা। বয়সের মাপকাটিতে এটুকু- অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় ক'রেছেন যে, কায়ক্লেশে শেষ দিনটি পর্য্যন্ত নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে চলার সুখ তাঁর সকল দুঃখ ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু অশোক কি সমারোহে দুঃখকে ভুলবে! জীবনের গণ্ডীতে দিনগুলো যেন সীমাবদ্ধ হ'য়ে গেছে! বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায়, আত্মীয়ের অকৃতজ্ঞতায়, প্রতিবাসীর নিষ্ঠুরতায় আবদ্ধ সে-দিনগুলো হ'য়ে এসেছে বিষাক্ত। এ পরিসর থেকে অশোক চায় নিষ্কৃতি। মুক্তির যে-পথ আজ সে আবিষ্কার ক'রেছে, তাই দিয়ে সে ফিরিয়ে আনবে তার

গৌরবের জয়মাল্য। আজ এ তার সঙ্কল্প, এ তার সাধনা, এ তার মৃত্যুপণ।

অশোক বিছানায় এসে বসল। আজ তার এতদিনকার শিক্ষা-অশিক্ষার সঞ্চয়কে যাচাই করবার দিন এসেছে। দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে তার জীবন, অসহ্য ঠেকছে আর এক মুহূর্ত্তও বেঁচে থাকতে। গাকে কাশী পাঠিয়ে সে ছেড়ে দেবে তার তরী : তার জীবন-তরীর নোঙর এতদিন পরে সে ওঠাবে। ঝড়-ঝঞ্ঝা বাঁচাতে গিয়ে বারে বারে সে কেবলই তাদের মাঝে গিয়ে পড়েছে অসহায়ভাবে,—যেখান থেকে পালিয়ে আসবার না পেয়েছে পথ, না পেয়েছে লক্ষ্য স্থলে পৌছানর নির্ভরতা। দূরের তরীগুলোকে আছড়ে-পড়া ঢেউয়ের সঙ্গে ক্রমাগত যুঝতে দেখে ভয় তার ভেঙ্গেছে। আর সে ভয় ক'রবে না দেবতার বজ্রকে, প্রকৃতির মত্ততাকে। দোটানায় পড়ে সে না পেয়েছে এগিয়ে যাবার অধিকার, না পেয়েছে পেছিয়ে আসবার অনুমতি। ভাসবান এই জগতের মতোন শুধু ভেসে বেড়ান ছাড়া আর কিছুই তার দ্বারা সম্ভব হয়নি। অসমসাহসিকতা আজ থেকে সে দূরে সরিয়ে দেবে নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে। এবার সে-ও যাবে ঐ উত্তেজিত দূরের ঢেউয়ের মুখে। এ মরাতে তার কোন ক্ষোভ নেই। পথের শেষে গিয়ে যদি তার তরী ডোবে ; তবু তার বলবার থাকবে পথ নির্ব্বাচনে সে ভুল করেনি ; লক্ষ্য তার বৃথা নয়। একটা হেস্ত নেস্ত এবার ক'রতেই হবে তাকে। ভীরু মন নিয়ে এতগুলো দিন তার কেটেছে কেবল তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝড় আর ঝঞ্ঝার আলিঙ্গন দেখে। কি মহোল্লাসে ওরা ছুটেছে দলে দলে ঐ গর্ব্বিত সাগরের ফেনাকে চোখ রাঙিয়ে আর সে কেবল ঢেউ গুণে কাটিয়েছে। ধিক্কারে তার অন্তর কুঁকড়ে গেল। আজ যে পথ-নির্দ্দেশ তাকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছে তার জন্যে সে সাহায্য নেবে না কারুর, ক'রবে

না ভিক্ষা, চাইবে না উপদেশ। এ পৃথিবীর সবাই অকৃতজ্ঞ ;—অকৃতজ্ঞ বন্ধু, অকৃতজ্ঞ আত্মীয়, চারিদিকে শুধু অকৃতজ্ঞতার ব্যভিচার। পৃথিবীর ঊর্দ্ধে দেবতারাও সকৃতজ্ঞ নয়,—তারা নিষ্ঠুর, তারা বিশ্বাসঘাতক। এ তার নতুনতর মতবাদ নয় ; অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। আজ থেকে সে দাম্ভীকতার জয়গান গেয়ে বেড়াবে। অলীক মায়া সে ত্যাগ ক'রবে। এবার থেকে দুরন্ত পথেই সুরু হবে তার যাত্রা। এতদিন সে যে ভুলটা ক'রেছে নিজেকে ভাল ছেলে ক'রে রেখে আজ তার প্রায়শ্চিত্তের দিন এসেছে।

আজকের এই অতন্দ্র নিশায় অশোকের না আছে শান্তি, না আছে সান্ত্বনা। রাত ঝিমিয়ে এসেছে : পাশের বিয়ে বাড়ী স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। শেষ রাতের মৃদু বাতাস জেগে উঠেছে। মাথার দিককার জানলা খুলে দিয়ে সে আবার তৈরী হ'ল আরো নতুন ক'রে ভাববার জন্যে। আর একটুও বিলম্ব সে সইবে না। কাল থেকেই সে উল্টে ফেলবে তার জীবনের পুরাণো পরিচ্ছেদগুলো। অতীতের জীবনের সঙ্গে কোথাও এতটুকু সামঞ্জস্য রাখবে না অনাগতের। সত্যিকারের বাঁচা কা'কে বলে সে দেখিয়ে দেবে নিজেকে। সে জাগিয়ে তুলবে তার অন্তরের সুপ্ত আত্মাকে। এবার থেকে সে তার ন্যায্য প্রতিষ্ঠা, প্রাপ্য সম্মান ও প্রতিপত্তি সমাজের কাছে আদায় ক'রে নেবে জোর ক'রে। সকলে তাকে ঘৃণা করে বলে সে সকলকে ভালবাসবে। কিনবে সকলের হৃদয় : জয় ক'রবে অত্যাচারীর মন। বন্ধনহীন জীবনে একমাত্র বন্ধন তার মা। যাকে এবার দূরে সরিয়ে দেবে সে। সরাতে হবে ভয়ে। ভয় তার মাকে নয় ; ভয় মাতৃস্নেহকে। তাই ভুলিয়ে রাখতে হবে তাঁকে দূরে। সে-স্নেহ বাধা দেয় : সে-মায়া সংযত করে। আজকের জীবনে তাদের কোন প্রয়োজন নেই।

কখন যে অশোক ঘুমিয়ে পড়েছিল, নিজেই তা সে জানতে পারলে না। ভোরের হাওয়ার স্পর্শে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

মা যুগবৎ বিস্ময়ে ও আতঙ্কে জিজ্ঞেস ক'রলেন, এত ভোরে উঠে পড়লি যে! রাত্তিরে ঘুম হয়নি বুঝি?

মায়ের ব্যথাতুর শঙ্কিত মুখখানির দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে অশোক বললে, ঘুম পালিয়ে যাবে আমাকে ফাঁকি দিয়ে? তুমি ক্ষেপেছ মা?

মা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ ক'রলেন।

অশোক বললে, দিন কতকের জন্যে তুমি কাশী যাও মা। তুমি কাছে থাকলেই আমার মাথায় রাজ্যের যত চিন্তা এসে ঢুকবে। তাই বলছিলাম, তুমি যদি কিছুদিনের জন্যে খুড়ীমার কাছে যাও…।

—তুই যখন বলছিস বাবা, যেতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুই একলা থাকবি কেমন ক'রে? চিরটাকাল তোর এই মা তোকে আগলে আগলে রেখেছে। আমি চলে গেলে একা থাকতে পারবি তো? যদি পারিস, আমার কোন অমত নেই বাবা।

মা যে এত সহজেই তার কথায় রাজী হবেন, এটা ছিল অশোকের কাছে অচিন্ত্যনীয়। সে তার স্বর্গগত বাবাকে পুনর্জ্জীবিত দেখলেও বোধ হয় এতটা আনন্দিত হ'ত না যতটা হ'ল আজ। আনন্দের আধিক্যে সে ফুটে উঠল: যেমন ফুটে ওঠে কোন মেয়ে কাজল-লতা খোঁপায় গুঁজে রেখে। এইবার থেকে সে সম্পূর্ণ একা: এত বড় বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে সে একটি স্বতন্ত্র জলবুদ্বুদ। দেওয়ালের দেবদেবীদের সে বারংবার জানালে তার প্রাণের প্রণতি। এতদিন পরে সে তার আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে সফল করবার সুযোগ পেয়ে অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর ওপর ক্ষণেক যেন সকৃতজ্ঞ হ'য়ে উঠল।

মা'র যাবার সময় ঘনিয়ে এল। তাঁর চক্ষু দু'টি লাল হ'য়ে উঠেছে কেঁদে কেঁদে। অশোক তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাকে ছেড়ে তিনি কাশীতে থাকবেন কি ক'রে? হয়তো বিশ্বনাথের মন্দিরে তার চিন্তাতেই তিনি বিভোর থাকবেন, দেবতার পূজা বার্থে পরিণত হবে। এতে তার অকল্যাণ হ'তে পাবে। সন্তানের মঙ্গল কামনায় যত তাঁর হৃদয় অধীর হ'য়ে ওঠে অশ্রু হ'যে ওঠে ততই দুর্নিবার।

অশোক সান্ত্বনা দেয়। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সাফল্যের হাজার প্রলোভন দেখায়। সন্তানের মঙ্গল ভিক্ষু মায়ের ভীরু চপল মন সেই আশাতে আবার পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে। চিরকাল যখন তিনি পুত্রকে চোখে চোখে রাখতে পারবেন না, তখন সে চেষ্টা ক'রতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। পুত্রের জয়ী হবার সঙ্কল্প তাঁর মনের তৃপ্তি পুনরায় ফিরিয়ে আনলে।

ট্রেণের হুইসিল বেজে উঠল।

অশোক চেঁচিযে বললে, আমার জন্যে যেন কোন অকৃতজ্ঞ দেবতার কাছে কিছু চেয়ো না মা। যা চাইবার তা শুধু তোমার পারলৌকিক মুক্তির জন্যেই চেযো। কৃপা আমি কখনো পাইনি, চাইও না কারুর কাছে। তা সে ওপরের দেবতাই হোক আর নীচের পাথরে গড়া বিগ্রহ-ই হোক।

মা ব্যথা ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে জল-ভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন পুত্রের মুখের দিকে।

অশোক বললে, দেবতার অনুগ্রহের চেয়ে আত্মনির্ভরতা এবার বড় বলে মনে ক'রছি মা। তাই আমার জন্যে দেবতাদের আর ঘুষ দেবার দরকার নেই।

মা বললেন, ছিঃ বাবা, ওসব কথা কি বলতে আছে, বাবা বিশ্বনাথ যে সদা-জাগ্রত।

ট্রেণ নড়ে উঠল।

অশোক বললে, অসুখ বিসুখ ক'রলে তখুনি আমায় চিঠিতে জানাবে। না হয় টেলিগ্রাম ক'রবে। খুড়িমার ঠিকানাটা রেখে দিয়েছ তো? দরকার হবে না ও সব কিছুর—শুধু মণিকর্ণিকার ঘাট আর খুড়িমার নাম বললেই যে কেউ দেখিয়ে দেবেখ'ণ।

আবার লাল আলো জ্বলে উঠল।

অশোকের চাঞ্চল্য এবার কাটল। মন এতক্ষণে তার স্থির হ'ল। সে প্ল্যাটফর্মের বেঞ্চে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। আজ সে জ্বালিয়ে নিলে যে আগুন তার দেহে ও মনে, সে-আগুনকে সে নিভতে দেবে না কিছুতেই,—যতদিন না তার নিজের চিতার শেষ রশ্মিটুকু বিলীন হ'য়ে যাচ্ছে। কর্ম্মজগতে এবার সে সাড়া তুলবে। টুকরো টুকরো ক'রে নিজেকে ভেঙ্গে হারিয়ে ফেলবে অনির্ব্বাণ এই কর্ম্ম কোলাহলে। অন্তর থেকে সমস্ত চিন্তা নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলে সে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। আর দেরী সে এক মিনিটও ক'রবে না। কালই সে সমস্ত বন্দোবস্ত করবার কাজে নিজেকে নিযুক্ত ক'রবে। বেরুতে তাকে হবেই। বেরুন তার চাই-ই। পৃথিবীর নির্জ্জন কোণে ঠায় বসে বসে সে কুণো হ'য়ে যাচ্ছে। দ্রুত পা ফেলে ফেলে সে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে এল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অশোক কেবলই ভেবেছে, কালকের প্রভাত প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে বদলে যাবে। এতদিন পরে তার তরী স্রোতের মুখ ধরেছে। গচ্ছিত টাকার একাংশ তুলে এনে সে খুড়িমার কাছে ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছে। মাসে মাসে মা যাতে সময় মতো পায়। বাকীগুলো নিয়ে সে এই বেশপতিবারের মেলেই পাড়ী দিয়ে দেবে ইজিপ্টে। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু রজত যাবার সময় সেখানকার সুবিস্তীর্ণ ব্যবসা ক্ষেত্রের যে হদিস তাকে দিয়ে গিয়েছিল

তার একটা কথাও যে ভোলেনি। কাল ভোরে উঠেই সে পাশ-পোর্টের জোগাড়ে ঘোরাঘুরি ক'রবে। দুপুরে যখন হোক ব্যাঙ্কে গেলেই হবেখ'ণ। বাড়ীটা রক্ষণাবেক্ষণের ভার আশুবাবু, তার ঈজিপ্ট প্রবাসী বন্ধুর বাবা নিজে যখন নিয়েছেন, তখন আর বিশেষ ভাববার কিছু নেই। এখানকার চিন্তাকে সে এখানেই রেখে যেতে পারবে দেখে অনেকটা খুসী হ'য়ে উঠল।

ঠাকুর একটা সে রেখেছিল আজ ক'দিন মা'কে দেখাবে বলেই যাতে না তাঁর মনে কোনরূপ কষ্ট হয়। বিদায়ের মুখে মায়ের দুশ্চিন্তা আর অশ্রু যদি অল্প আয়াসে রদ করা যায় সেই মতলবে। মা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাকে বিদায় ক'রে দিয়েছে। তিনটে দিন সে যা হোক খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে। খাওয়াটাই তো জীবনের একমাত্র কাম্য নয়। তাকে মানুষ হ'তে হবে। তাকে জয়ী হ'তে হবে। ঘৃণা আর অবজ্ঞা, চোখ রাঙানি আর ছিঃ ছিঃ সে এই অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর কাছে এত পেয়ে এসেছে যে তার ইয়ত্তা নেই। শুধু সে বলেই এতদিন মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে। দুঃখ আর দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হ'য়ে এসেছে বলে তাকে এত সব ভ্রূকুটি সহ্য ক'রতে হ'য়েছে। আজ আর সে তা ক'রবে না। আজ সে-ও ওই মহাসমুদ্রের ন্যায় গর্জ্জে উঠবে। ক্রমশই সে উত্তেজিত হ'তে লাগল।

অবিন্যস্ত মন নিয়ে অশোক পাশ ফিরলে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার সান্নিধ্যে এসেও সে মায়ের ম্লান মুর্ত্তিখানি ভুলতে পারছে না। অন্যদিন এতক্ষণ মা এসে কতবার খোঁজ নিয়ে যেতেন, কেন এখনো আলো জ্বালা রয়েছে। আজ সারারাত ঘরে আলো জ্বালা থাকলেও কেউ এসে জিজ্ঞেস ক'রবে না, কেন তার এই রাত-জাগা। মা বিশ্বনাথকে নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, সেই হয়তো তাঁর সান্ত্বনা। ও যে মানুষের-গড়া পুতুল, মা তা জানেন না। মা তা মানেন না। সন্তানের ভয়ে পাথরকেও

মা চটাতে চান না। আজ সে একেবারে মুক্ত। কিন্তু এ মুক্তির মাঝেও যে-বন্ধনের চেতনা রয়েছে, তার কি অব্যহতি নেই? মায়ের অভাব তার নিভৃত অন্তরে অনুভূতি জাগাতে চায় কেন? অথচ মা এতক্ষণে গয়ায়। আর ক'টা ঘণ্টা কাটলেই মা কাশী গিয়ে পৌছুবেন। নতুন গঙ্গা, নতুন আকাশ, নতুন পুতুলের সঙ্গে তাঁর ভাব হবে। মা আর ছেলে মাটির পৃথিবীর অকৃতজ্ঞতায় একদিন সম্পূর্ণ মিশে যাবে এই পৃথিবীর মাটিতে আর অকৃতজ্ঞ পৃথিবী ফিরেও তাকাবে না তাদের পানে, কোনদিন ক'রবে না তাদের স্মরণ। অকৃতজ্ঞ পৃথিবী—অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর সবাই। ঘুসিটা জোর ক'রে পাকিয়ে অশোক চিৎকার ক'রে উঠল।

তারার সখীর দল জেগে রয়েছে স্তিমিত নয়নে। অশোক আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘুমবার চেষ্টা ক'রলে।

বম্বে থেকে জাহাজ ছেড়ে দেবার কালে ভারতের উপকূল প্রান্তের দিকে চেয়ে অশোকের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। না জানি, মা এখন বিশ্বনাথের কাছে তার জন্যে কত কি যাচ্ঞা ক'রছেন। পুত্রের অমঙ্গলের আশঙ্কায় মানৎ ক'রে ক'রে তিনি দেবতাকে ঋণী ক'রে ফেলেছেন নিজের কাছে। কিন্তু বিমুখ দেবতার কাছে প্রার্থনার মূল্য কতটুকু!

কালো জলের মিল ধরবার জন্যে অনেকদিন থেকে আকাশ মেঘ সঞ্চার ক'রে ফিরেছে, আজ সন্ধ্যায় তাই বুঝি ঝড়ের এই বিপুল সমারোহ। কেবিনে চুপ ক'রে শুয়ে শুয়ে অশোক আকাশ দেখছে, এলোমেলো মেঘের জটা, বিদ্যুতের ঝিকিমিকি আর কথা-ভরা অন্ধকার। শুনছে সমুদ্রের গর্জ্জন। তার চোখের কোণে ফোঁটা ফোঁটা জল এসে জমেছে, দমকা বাতাস দু'একটা বৃষ্টির কণা ললাটে, চোখের পাতায় উপহার দিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে এ যেন তার মায়ের

হাতের কম্পিত স্পর্শ। আজ মায়ের কথা অনুভব ক'রে হৃদয় তার খুসীতে ভরে উঠল। সে এলিজা লিসিকে ডেকে আনতে চলল। এলিজা প্রস্তুত ছিল না। এ সময় মিঃ রয় প্রকৃতির অপূর্ব্ব সাহচর্য্য ত্যাগ ক'রে তার সঙ্গে দেখা ক'রতে আসবেন, এটা কষ্ট ক'রে কল্পনা করাও তার পক্ষে কঠিন। তাড়াতাড়ি দোলান চেয়ারখানা ছেড়ে অভ্যর্থনা ক'রতে সে উঠে দাঁড়াল।

অশোক বললে, নির্জ্জনতা মোটেই ভাল লাগছে না বলে আপনার সঙ্গে গল্প ক'রতে এলাম। এসে আপনাকে বিরক্ত ক'রলাম না তো?

এলিজা হেসে বললে, ধন্যবাদ, এ রকম জ্বালাতন করবার অধিকার আমি আপনাকে দিলুম।

অশোক বললে, আচ্ছা মিস্ লিসি, আমাদের দেশটা আপনার কেমন বোধ হয়!

এলিজা বললে, যাই বলুন মিঃ রয়, আপনাদের দেশের লোকের কল্পনাপ্রবণ প্রাণ আছে আর আছে তাদের সরল বিশ্বাস। বাঁচবার নিষ্ঠায় তারা পাশ্চাত্যের কাছে পশ্চাদ্‌পদ কিন্তু জীবনে ত্যাগ স্বীকার করে তারা অসংখ্য। আমাদের দেশে যদি কখনও যান, মিলিয়ে দেখবেন তখন আমার কথা।

অশোক তার কথায় খুসী না হ'য়ে পারলে না। আত্মসুখ সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য তাহ'লে ভারতের ত্যাগ আর আত্মসংযমের নীতিকে শ্রদ্ধা করে। হাসবার চেষ্টা ক'রে সে বললে, আপনাদের দেশে আমার যাবার ইচ্ছে আছে কেবল নিয়ম নিষ্ঠা শেখবার জন্যে। কর্ম্মের প্রেরণায় নিজেকে কর্ম্মঠ ক'রে তুলব বলে। তবে যাওয়া শেষ পর্য্যন্ত ঘটে উঠবে কি না তা বলতে পারি না মিস্ লিসি। এখন আমার কাজ শুধু ঈজিপ্টেই।

এলিজা বললে, কিন্তু আপনাদের দেশের মেয়েরা বন্দিনী। তাছাড়া আপনাদের এখনো এমন কতকগুলো সংস্কার রয়েছে, যেগুলোকে কু-সংস্কার না বলে পারা যায় না।

অশোক বললে, আপনি ঠিকই লক্ষ্য করেছেন মিস্ লিসি। দেখছি আপনার নজরে সামান্য খুঁটি-নাটি জিনিষগুলো পর্য্যন্ত ধরা পড়েছে।

এলিজা বললে, ভারতের সভ্যতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। ভারতকে নিবিড়ভাবে জানবার জন্যেই আমার আসা। নইলে এই ওয়ার এণ্ড রেভোলিউশ্যানের যুগে কে আর সখ ক'রে বেড়াতে বেরোয়? আমি এসেছিলুম শুধু আমার বইখানার উপাদান সংগ্রহ করবার জন্যে।

অশোক জিজ্ঞেস করলে, কি কি পেলেন?

এলিজা উত্তরে জানালে, পেলুম অনেক। যা আশা ক'রিনি, তা-ও পেয়েছি। শুনবেন কি কি লাভ হ'ল!

অশোক আপত্তি জানিয়ে বললে, না, থাক এখন। ও কথা শোনবার ঢের সময় পাব। মোটের ওপর আপনি ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা নিয়ে ফিরছেন আপনার দেশে।

এলিজা বললে, নিশ্চয়ই। আমি বিশ্বাস করি ভারতই একদিন জগতকে মুক্তির বাণী শোনাবে।

অশোক বললে, এই কথাটা আমি আরো অনেকের মুখে বলতে শুনেছি।

মায়ের চিন্তা অশোকের মন থেকে সরে গেল। এলিজা লিসিকে কেন্দ্র ক'রে সে আকাশ-কুসুম রচনা ক'রলে। এলিজা শুধু বাহিরটা দেখে এসেছে তাই বলতে পেরেছে, ভারতের লোকের প্রাণ আছে, আছে তাদের জীবনে ছন্দ। সে আজ অকৃতজ্ঞ পৃথিবীকে প্রথম কৃতজ্ঞ বলে জানতে পারলে।

আনন্দিত চিত্তে অশোক কেবিনে ফিরে এল। আশুবাবু অনেক ক'রে বলে দিয়েছেন করাচিতে পৌছানর খবরটা যেন তিনি পান। অনেকদিন হ'ল কলকাতা শহর সে ছেড়ে এসেছে কিন্তু তার মনে হচ্ছে যেন কত যুগ। এরি মধ্যে কত পরিবর্ত্তন না জানি সেখানে হ'য়ে গেছে। হয়তো বাড়ীখানায় ভাড়াটে এসেছে। তাদের কলহাস্যে নীরব বাড়ীখানি মুখর হ'য়ে উঠেছে। হয়তো বা মায়ের চিঠি এসে মেঝেতে লুটাচ্ছে। সে লুণ্ঠিত চিঠির অর্থ সকলে বুঝবে না। যে বুঝত, সে এখন অগাধ জলরাশির মধ্যে এসে পড়েছে।

বৃষ্টির সুরে আজ ভারী ব্যথা। কি অপরূপ এই বিচিত্র অন্ধকারটি। অশোকের আজ এইখানে মায়ের একখানা চিঠি পেতে কেবলই ইচ্ছে যাচ্ছে। অনেকখানি দুশ্চিন্তা তাহ'লে তার দূর হ'য়ে যায়। এই কালো ঘনপুঞ্জ মেঘের মাঝে যদি কোন অলৌকিক বারতা আসে, যে বারতায় থাকবে মায়ের প্রসন্ন মুখের ক্ষমা আর আশীর্ব্বাদ, তাহ'লে—তাহ'লে যাত্রা তার সার্থক হ'য়ে উঠবে : মনের গ্লানি সব মুছে যাবে। কিন্তু মা, তার চিরদুঃখিনী জননী কত দূরে—কত অসহায়।

জাহাজখানি কি জানি কেন থেমে গেছে। অশোকের আর ভাল লাগছে না। তার ইচ্ছে হ'চ্ছে এই অতল গর্জ্জীয়মান সমুদ্র ভেদ ক'রে সে চলুক। মাঝে আবার থামা কেন? চলুক নতুন জগতে নতুন আলোকের সন্ধানে, যাতে সে ভুল ক'রেও ভুলতে পারবে এই অকৃতজ্ঞ, নিষ্ঠুর, কঠিন পৃথিবীকে।

জাহাজ আবার চলল—ফিকে নীল, ঘন কালো, পাতলা রূপালী জলের মধ্যে দিয়ে। ঢেউয়ের পর ঢেউ ফেনিল আভাময় জল উছলে এসে জাহাজখানাকে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে। অশোকের ভাল লাগছিল না। কেবলই তার মনে হ'চ্ছিল, মায়ের কোলে সে পুনরায় ফিরে যাক। তাঁকে বঞ্চনা ক'রে এতদূরে এসে সে ভাল কাজ করেনি।

শিথিল প্রায় ঐ এক বন্ধন। যাকে ঘিরেই তার জীবনের অনুরণন। মায়েরও সে ছাড়া আর কেউ এ জগতে নেই। মায়ের কথা যতই তার মনে জাগছে, ততই সে যেন তার আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছে, তার অটল সঙ্কল্প যেন শিথিল হ'য়ে আসছে, তার মনের ঐক্যের যেন খেই খুঁজে পাচ্ছে না। মা যখন জানবেন তার এই দূরে পলায়নের কথা, বুক-ফাটা কান্নায় যখন তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়বেন, তখন কে দেবে তাঁকে সান্ত্বনা, কে দেবে ভরসা, কে তাঁর অসহ্য যাতনায় প্রকাশ ক'রবে সমবেদনা।...কিন্তু এসব কি সে যা-তা ভাবছে। তাকে আশুবাবুকে চিঠির উত্তর দিতে হবে। এখুনি লিখে ফেললে মন্দ হয় না। কাগজের প্যাডটা বার ক'রে আপন মনে অশোক কত কথা লিখে গেল, এই উদ্বেল ব্যাকুলতার সুরে সুরে, এই কাজল সুপ্তিভরা অন্ধকারের গহীন রাতে।

সকালে উঠে অশোক দেখলে জাহাজখানা একেবারে ডাঙার বুকে এসে ভিড়েছে। সকাল আটটার সময় ছাড়বে আবার। এবারের পাড়ি এক মহাদেশ ছেড়ে আর এক মহাদেশের উদ্দেশে। মাঝের ক'টা দিন কেটে গেলে সে বাঁচে। আটটার কিছু পরে ভোঁ-ভোঁ শব্দ ক'রে সবাইকে জানিয়ে জাহাজ ছাড়ল। উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের মুখে যেন পরিপূর্ণ প্রশস্তির দীপ্তি। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে চারিধারের তরঙ্গায়িত ফেনিল জলোচ্ছ্বাসের পানে চেয়ে চেয়ে তার কেবলই মনে পড়ছিল মায়ের সদা কল্যাণময়ী মূর্ত্তিখানি। এলিজা এসে তার পাশে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ দু'জনে নির্ব্বাক নিস্পন্দ হ'য়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল।

এলিজাই প্রথমে মৌনতা ভেঙে কথা বললে, চলুন মিঃ রয়, একটু বিলিয়ার্ড খেলে আসি। মিঃ ট্রাম্পফোর্ড আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রছেন।

দুর্ব্বল মন নিয়ে অশোক এলিজার কথা অবহেলা ক'রতে পারলে না। নীরবেই সে তার সম্মতি জ্ঞাপন ক'রলে। তারপর হন্ হন্ ক'রে চলল এলিজার হাতখানা জোর ক'রে চেপে।

বিলিয়ার্ড হলে ঢুকতেই মিঃ ষ্ট্রামপ্‌ফোর্ড বললেন, বড়ই দুঃসংবাদ মিঃ রয়, মিসেস্ হেন্ ফ্রে পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে হার্ট ফেল করে এইমাত্র মারা গেলেন।

অশোক আঁতকে উঠল। মিসেস্ হেন্ ফ্রে মারা গেলেন?

এলিজা বললে, দুঃখু করবার কিছু নেই মিঃ রয় কারণ তিনি নব্বই বছরের বৃদ্ধা।

অশোকের চোখের সামে আবার মায়ের ক্ষীয়মান ম্লান করুণ মূর্ত্তিটি যেন পরিস্ফুট হ'য়ে উঠল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে বললে, মিস্ লিসি, আমায় ক্ষমা ক'রবেন। আজকের এই দুঃখের দিনে আনন্দ উৎসবে মাতামাতি ক'রতে মোটেই ভাল লাগছে না। তাকে কথা বলবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত না দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো সে কেবিনে ফিরে এল। বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হ'য়ে যদি তার মা, তার জন্ম-দুঃখিনী মায়েরও মৃত্যু হয়। অশোক অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠল। অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর অকৃতজ্ঞ সন্তান নিজেকে কেমন ক'রে তাহ'লে ক্ষমা ক'রবে? চায় না সে উন্নতি, চায় না সে জীবনের জয় গৌরব। মায়ের অকৃতজ্ঞ সন্তান সে—তবু সে তার দুঃখিনী মায়ের স্নেহ ছায়া নীড়ে ফিরে যাবে। হোক পৃথিবী অকৃতজ্ঞ, মানুষ অকৃতজ্ঞ, দেবতা অকৃতজ্ঞ—অকৃতজ্ঞ সন্তানের মা তো কারুর কাছে অকৃতজ্ঞ নয়।

অশোক সুটকেশগুলো গুছিয়ে ঠিক হ'য়ে রইল। পরের বন্দরেই সে নেমে পড়বে।

দুর্ব্বল মন।
না। নীরবেই।
চলল এলিজার
বিলিয়ার্ড হ
মিঃ রয়, মিসে
এইমাত্র যারা ে
অশোক অঁ
এলিজা ব
নব্বই বছরের
অশোকের
মূর্ত্তিটি যেন প
বললে, মিস্ ি
আনন্দ উৎসবে
কথা বলবার
ফিরে এল।
দুঃখিনী মায়ে
পৃথিবীর অকৃত
চায় না সে উ
সন্তান সে—
হোক পৃথিবী
সন্তানের মা
অশোক
সে নেমে প